চতুর্থ অধ্যায়
সমাজ সংগঠনে মতুয়া সম্প্রদায়ের ভূমিকা

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তগণ হরিবোলা 'মতো' নামে আখ্যায়িত। হরিনাম কৃষ্ণনাম ছিল এক ও অভিন্ন ভক্তি ভাবনা। কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুরকে তৎকালীন সমাজের বহুভক্ত মানুষেরা 'হরি' অবতার বলে ভক্তি করেছে এবং 'হরিবল' নামে জোর দিয়েছেন তৎকালীন ভক্ত মানুষগুলি। 'হরিনাম'কারী সকলকে হরিবোলা 'মতো' বা 'মতুয়া' উপাধি দিয়েছে গ্রামবাসীগণ। সেই যে মতুয়া উপাধিতে ভূষিত হলেন হরিনামে মত্ত মানুষগুলি তা কিন্তু হরিচাঁদ ঠাকুর মেনে নিলেন। আর ভক্তদের মধ্যে ভক্তির প্রাবল্য জনিত কারণেই এই মত বিরোধ ঘটেছে আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভক্ত মানুষগুলিকে 'হরিবোলা' 'মতো' নামে অভিহিত করলেন, সেই থেকে তাদের নাম মতুয়া হয়েছে। 'মতুয়া' মানুষগুলির ভক্তি ভাবনার জন্য দরাকর সমাজ বিধি, ধর্ম ভাবনার গতি প্রকৃতি ও সমাজ মানুষের সার্বিক পরিকাঠামো। এই ভক্ত মানুষগুলি সমাজ কীভাবে সামগ্রিক জীবন যাপন করবেন সেই সমস্তই নিয়ম রীতি কীভাবে গঠিত সেগুলিই আমার এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

'মতুয়া' খ্যাতির আগেই হরিচাঁদ ঠাকুরের 'হরি' রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটে ছিল মানুষের কাছে। 'রাউৎখামার গ্রামে প্রভুত্ব প্রকাশ ও ভক্ত সঙ্গে নিজালয় গমণ' অংশের থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত মানব সমাজে 'হরিঅবতার' রূপেই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে ছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার তাঁর আকরগ্রন্থ 'শ্রশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে হরিচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে ভক্ত মানুষের ভক্তির বর্ণনা করেছেন—

''আত্ম সমর্পিয়া ভক্তি করে রামচাঁদ।
ভক্তিতে হলেন বাধ্য প্রভু হরিচাঁদ।।
শ্রীবংশী বদন আর শ্রীরাম সুন্দর।
বাসীরাম কাশীরাম শ্রীরামকিশোর।।
বালাদের বাড়ী দিন দুদিন থাকিল।
বালারা সগণ সহ মাতিয়া উঠিল।।

ভক্তগণ সঙ্গে করি হরিপ্রেম রসে।
নাম গান ভাবে মত্ত মনের উল্লাসে।।
দেশভরি শব্দ হল মধুর মধুর।
যশোবন্ত ছেলে হরি হয়েছে ঠাকুর।।
রোগ যুক্ত লোক যত প্রভু স্থানে যায়।
কীর্ত্তনের ধূলা অঙ্গে মাখিবারে কয়।।
অমনি সারিয়া ব্যাধি করে সংকীর্ত্তন।
কেহ বা লোটায় ধরে প্রভুর চরণ।।"[১]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে একেবারে প্রথমাবস্থায় যাঁরা হরিচাঁদ পারিষদ বলে খ্যাত হয়েছিলেন তাদের বহু ভক্তের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য। ভক্ত হৃদয় সর্বদাই নিজ অনুরূপ ভগবানের সন্ধান করে। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের বাল্যাবস্থা থেকেই কয়েকজন ভক্ত মানুষ ছিল তাঁর নিত্য সহচর। তার পরবর্তী সময়ে ওড়াকাঁন্দি বাসকালে আর অনেক মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাথি ছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পারিষদের প্রথমাবস্থার একটি বর্ণনা করেন যা থেকে আমরা জানতে পারি 'মতুয়া' খ্যাতির পূর্ববর্তীকালের ভক্তগণ ও তৎসময়ের ও তৎপরবর্তীকালের অগণিত মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনায় যুক্ত হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত 'সূক্ষ্মসনাতন ধর্ম' পালন করতে শুরু করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর কখনো একা কোন কাজ করেন নি, তার সহযোগী মানুষের অভাব হয়নি কর্ম সম্পাদনের জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে ভক্তদের যে ধর্ম দর্শন দান করেন তা সকলেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। যে ভক্ত মানুষগুলি তাকে ভগবান বলে বিশ্বাস করতেন তারা সর্ব প্রথমেই তাকে 'হরি অবতার' গ্রহণ করেন নি। হরিচাঁদ ঠাকুরও ভক্তদের দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন বহুবার বহুভাবে। আর একথা প্রায় বেশিরভাগ ভক্তদের সম্পর্কেই বলা যায়। পরীক্ষার পর ভক্তদের কাছে তিনিই হলেন ভক্তের ভগবান হরিচাঁদ ঠাকুর। এমনকি 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচয়িতা কবিরসরাজ তারক চন্দ্রও ঠাকুরকে পরীক্ষা করেছিলেন। কবি তারকচন্দ্র সরকার একাধারে ভক্ত এবং শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুর কীভাবে ভক্তদের কাছে পরীক্ষিত হয়েছিলেন সেই পরীক্ষাগুলিতেই হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রটিকে পাব যিনি মানবতার যথার্থ পূজারী। তারকচন্দ্র সরকার প্রথমে হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং বলে স্বীকার করেন নি। তারকচন্দ্র সরকার

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মহাশয়ের কাছে শাস্ত্র অধ্যায়ন করতেন। তার কাছে জানতে পারেন যে 'হরি অবতার' কিন্তু তারকচন্দ্র সরকারের মনে বিশ্বাস হয় না যে স্বয়ং 'হরি' অবতার হয়েছে। একথাও তারকচন্দ্র সরকার বলেন গৌরাঙ্গের পর আর কোথায় অবতার। তখন অবিশ্বাসী মনকে বিশ্বাস করানোর জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মহাশয় তারকচন্দ্র সরকারকে সঙ্গে নিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরকে দর্শনের জন্য নিয়ে যান ওড়াকাঁন্দি। হরিচাঁদ ঠাকুরকে তারকচন্দ্র সরকার দেখেছেন যেমন তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ংস্বরূপ বলে বিশ্বাস করেছেন। পরবর্তীকালে তারকচন্দ্র সরকারই 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচনা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনের পূর্ণাঙ্গ কাহিনিটি তুলে ধরলাম আলোচনার সুবিধার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে তারক ছিল বড় আদরের ধন। হরিচাঁদ ঠাকুর তারকচন্দ্র সরকারকে খুব স্নেহ করতেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল ভক্ত মানুষই তারকচন্দ্রকে বড় ভালো বাসতেন। তারকচন্দ্র সরকারের আত্ম পরিচয়টিও হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শন প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম জীবন সম্পর্কেও কতকটা পরিস্ফুট হয়েছে। এখানে তারকচন্দ্র সরকারের হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শন অধ্যায়টি সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরলাম—

''কাশীনাথ নামে সাধু জিলা যশোহরে।
নমঃশূদ্র জাতি গ্রাম জয়পুরে।।
তাহার নন্দন আমি অতি অভাজন।
শ্রীতারক সরকার জানে সর্ব্বজন।।
মৃত্যুঞ্জয় পদসেবী তাহার আশ্রিত।
তাঁর কৃপাক্রমে চিনি বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত।।
সেই প্রভু মোর কাছে কহে সমাচার।
'তারক রে জান নারে হরি অবতার।'
আমি বলি 'প্রভু যদি ইহা সত্য হয়।
সেই হরিচাঁদে আমি দেখিব নিশ্চয়।।
অবতার হলে আছে লক্ষণ তাহার।
গৌরাঙ্গের পরে পুনঃ কোথা অবতার?
সাধক মহান্তকেহ মহাশক্তিশালী।

ওড়াকাঁদি অবতীর্ণ হরি হরি বলি।।'

মৃত্যুঞ্জয় বলে 'তুমি জাননা তারক।

পূর্ণব্রহ্ম হরিচাঁদ ভূবন পালক।।

যদি না বিশ্বাস কর মোর সাথে চল।

দেখিলে বুঝিতে পাবে জীবন সফল।' ''[২]

তারকচন্দ্র সরকারের সফল জীবন সত্যই হল। তিনিই হলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের বিশ্বাসের প্রিয় পাত্র। মৃত্যুঞ্জয় কথা শুনে তারকচন্দ্র সরকারের হৃদয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনের আগ্রহ জাগ্রত হল এবং পরদিন যাওয়ার জন্য মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়কে বললেন—

''এত কথা শুনি মনে আগ্রহ হইল।

মৃত্যুঞ্জয়ে বলি প্রভু ওড়াকাঁদি চল।।

ওড়াকাঁন্দি উপনীত হই পরদিনে।

দূর হইতে শ্রীমূর্ত্তি দেখিনু নয়নে।।

উজ্জ্বল শ্যামল কান্তি নিবু নিবু আভা।

রক্ত রাগ যুত পদ বরণীয় শোভা।।

দীর্ঘ কেশ দীর্ঘভুজ আয়ত লোচন।

মরি! মরি! হাসি হাসি প্রফুল্ল বদন।।

বসিয়া আছেন প্রভু ধ্যান মগ্ন প্রায়।

মহাভাব সমাধিস্থ মহাভাব ময়।।

বিরহিনী নদী যথা সাগরে মিলায়।

মমচিত্ত গঙ্গা তথা শ্রীপদে লুটায়।।

নয়নের জলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইল।

দ্বাত্রিংশ লক্ষণ তাহে ভাসিয়া উঠিল।।

অষ্টবজ্র ধ্বজ চক্র সব দেখা যায়।

বক্ষেতে কৌস্তভ মণি পদে গঙ্গা বয়।।

ভুলিনু জগৎ হেরি জগদিষ্ট রূপ।

নিশ্চয় বুঝিনু হরি স্বয়ং স্বরূপ।।

কৃপা করি বাণীনাথ কহে মোরে বাণী।

'তুইরে ময়নার ছা' তারক বাছানি।।

কার পোষা পাখী তোর তাহা মনে নাই।।

মৃত্যুঞ্জয় তোরে আনে তাই তোরে পাই।।

যাও বাপ ঘরে যাও কর কাজ কর্ম।

সংসারের মোহে যেন ভুলিও না ধর্ম।।

তন্দ্রমন্ত্র ভেক্ ঝোলা সব ধাধাবাজী।

পবিত্র চরিত্রে থেকে হত্ত কাজে কাজী।।

সেই হতে রচি পদ 'কাজ কি মন্ত্রবীজে।'

হরি রবি কিরণেতে মধু চিত্ত মাঝে।।''[৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর তারকচন্দ্র সরকারের মনোবাঞ্ছিত ভগবানের চিত্রকে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সেই তারকচন্দ্রই হলেন পরবর্তীতে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় পাত্র এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের ও প্রিয় ছিলেন তারকচন্দ্র সরকার। এমনকি তৎকালীন সকল মতুয়া ভক্তগণ তারকচন্দ্রকে বড় স্নেহ করতেন। এই তারকচন্দ্র সরকারকে দু'জন গ্রন্থ রচনা কালে যা বলেছেন তা থেকেই বোঝা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের কর্মাদর্শও ধর্মাদর্শের পরিচয়। গোস্বামী গোলকচন্দ্র ও বড় ভাল বাসতেন প্রিয় তারককে। কবি নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত সকলের প্রিয় ছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারকে গ্রন্থ রচনার জন্য 'বর' প্রদান করেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারেই তারকচন্দ্র লিখতে সম্মত হন এবং গোলক গোস্বামীও বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের লীলা কথা লিখে দিতে। গোলক গোস্বামী যা তারককে বলেছিলেন সেই কথাই কবি গ্রন্থ রচনার প্রথমে বলছেন—

''মৃত্যুঞ্জয় দশরথ আর মহানন্দ।

তোরে করে ফেলাফেলি তাদের আনন্দ।।

শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।

লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে।।

যা দেখিস যা শুনিস তাহাত লিখিবি।

না দেখিলি না শুনিলি কেমনে পারিবি।।

কোন ঠাঁই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।

আরোপে দেখিবি হরি-চরণার বিন্দ।।

অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হবে প্রেমানন্দ।

হৃদয় আসিয়া লেখাইবে হরিচন্দ্র।।''[৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত সমাজের কাজ যেভাবে করেছিলেন তাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। কারণ তারকচন্দ্র সরকার হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক হওয়ায় তিনি বেশির ভাগ সময় হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে থাকতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে থেকে অনেক কাজের সাক্ষী হয়েছিলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার অনেক সময় ওড়াকাঁদির ঠাকুর বাড়িতে থাকতেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্তালয় ও গমন করতেন ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মদর্শ ও মানুষের প্রতি তার যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা সর্বংশেই সত্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভক্ত 'লালচাঁদ মালাকারের উপাখ্যান' থেকে বোঝা যায় তারকচন্দ্র সরকারের সঙ্গে ঠাকুরের আত্মিক সম্পর্ককে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''.....

একদা সকালে প্রভু বসিয়া নির্জনে।

একমাত্র তারক বসিয়া প্রভু স্থানে।।

হরিচাঁদ কহিলেন তারকের ঠাঁই।

চলরে তারক মোরা রাজপাট যাই।।

রাজ পাট লালচাঁদ কট করিয়াছে।

আমাকে খাওয়াবে আম সে খাইবে পাছে।।''[৫]

সমাজ সংগঠন সম্পর্কে 'সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম' বা মতুয়া ধর্ম কি ভূমিকা পালন করেছিল তৎকালীন সময়ে সেই সমাজ সংগঠন আজকের যুগে কতটা কার্যকারী বা যুগপোযোগী মানুষের। সেই সময় সমাজে কীভাবে মতুয়া ধর্মের প্রসার ঘটেছিল তার আলোচনা তারকচন্দ্র সরকার ও তাঁর কিছু পরবর্তীকালের লেখকগণ তাদের রচনাবলীতে ব্যক্ত করেছেন। 'মতুয়া' ধর্মের সঙ্গে সবসময় সরাসরি ভাবেই যুক্ত থেকেছেন, এই ভক্ত লেখকগণ সর্বপরি একথা বলে আরও নিশ্চিত হব যে লেখকগণ সকলেই 'মতুয়া' ধর্ম বা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মই পালন করছেন।

সেই সকল লেখকদের আকরগ্রন্থ থেকেই সমাজ সংগঠনে 'মতুয়া' ধর্মের প্রভাব আলোচনা করব। প্রথমেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনা অনুযায়ী সমাজ সংগঠন ও তারপরে গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই পূর্ব ভাবনা অনুযায়ী সমাজ সংগঠন করে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরও ভক্তগণের বিভিন্ন কার্যাবলীর পরিচয় গ্রহণ করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য সমাজ সংগঠনে মতুয়াধর্মের ভূমিকাকে কয়েকটি ভাগ করে আলোচনা করব। যথা—

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা :

ঊনবিংশ শতককে নবজাগরণ কাল বলা হয়। এই নবজাগরণ মানুষের নবচেতনার উন্মোচন ঘটায়। মানুষ এই সময় থেকে ধর্মভাবনাকে যুক্তি বিজ্ঞানের দ্বারা পরীক্ষা করে সেই আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য সচেষ্ট হল কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ। হরিচাঁদ ঠাকুর এই পাশ্চাত্য জ্ঞান বা শিক্ষা চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হন নি একথা সর্বাংশেই সত্য যেমন তেমনি ভাবে একথা বলা যায় তিনি যেভাবে মানুষের মানবতা বোধের আত্মজাগরণের জন্য কাজ করলেন তা উনিশ শতক কেন সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত খুঁজলেও তাঁর মতো কাজ বিরল। মানুষের জীবন ধারণ করার জন্য যা কিছু প্রথম থেকে প্রয়োজন তার জন্য ভেবেছেন মানুষের জীবনের উপযোগী করে। এদিক থেকে তাকে এক এবং অদ্বিতীয় বলাই যায়। এবার হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ ও কর্মাদর্শকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব।

'ভক্তগণের মহাসংকীর্ত্তনোচ্ছাস' পর্বে দেখা যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের অগণিতভক্তের মধ্যে কয়েকজনকে তারকচন্দ্র সরকার পূর্ব পারিষদ বলে ব্যক্ত করেছেন। ভগবানের দর্শন পেলে মানুষের সার্বিক কল্যাণ হয় এই চিরাচরিত বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখব তিনি মানুষের জীবনের সার্বিক কল্যাণ কীভাবে করেছেন। কবির বর্ণনায় ভক্তগণের পরিচয় পাই—

"……

প্রেম অনুরাগে সব ভকত জুটিল।

'মতুয়া' বলিয়া দেশে ঘোষণা হইল।।

মঙ্গল নাটুয়া বিশে পূর্ব্ব পারিষদ।

ওড়াকাঁন্দিবাসী পারিষদ রামচাঁদ।

ভজরাম চৌধুরীর ছোট ভাই যেই।

ঠাকুরের ঐকান্তিক পারিষদ সেই।।

কুবের বৈরাগী রামকুমার ভকত।

প্রভুর ভকত সেই হয়েছে ব্যকত।।

গোবিন্দ মতুয়া আর স্বরূপ চৌধুরী।

প্রেমাবেশে ভাবে মেতে বলে হরি হরি।।

চূড়ামণি বুধই বৈরাগী দুই ভাই।

হরিচাঁদ পেয়ে আনন্দের সীমা নাই।।''[৬]

ভক্তগণ মিলে একসঙ্গে 'হরিনাম' করার সময় কীভাবে পার হত তা ভক্তগণ বুঝতে পারতেন না। ভক্তগণ এতটাই নাম গাণে মত্ত হয়ে থাকত একথা কবির বর্ণনায় এভাবে ধরা পড়েছে—

''ভক্তগণে হুঙ্কারিত বলে হরিচাঁদ।

সে ধ্বনি শ্রবণে যেন মত্ত সিংহ নাদ।।

সবলোকে মত্ত হয়ে দিত হরিধ্বনি।

তাহাতে হইত যেন কম্পিতা মেদিনী।

কেহ না জানিত দিবা কীভাবেতে গেল।

না জানিত যামিনী কীভাবে গত হল।।''[৭]

দিবস রজনী ব্যাপি নাম গান করতে করতে মানুষ ভক্তির দ্বারাই আপ্লুত থাকতেন। আর এই ভক্তি ভাবনার দ্বারাই প্রথম হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে একত্রে সংঘবদ্ধ করলেন। তাদের সঙ্গে তিনি একত্ম হয়ে মিশে গেলেন। এভাবেই তিনি মানুষকে একান্ত আপনার জন করে তুললেন যেমন অপরদিকে সকল ভক্ত মানুষেরও তিনিই একমাত্র স্মরণ্য হলেন তার কর্মের দ্বারা। হরিচাঁদ ঠাকুর তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম সময় থেকেই প্রায়ই ভক্তদের সঙ্গে ভ্রমণ করতেন এবং নিজ বাড়িতে অল্প সময়ই বাস করতে পারতেন ভক্তদের জন্য। ভক্ত মানুষদের সঙ্গে থেকেই তিনি তাদের আত্মীক উন্নতি, পারিবারিক উন্নতি এবং শারীরিক সুস্থতাকে সর্বদাই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের যে সার্বিক উন্নতিকরণ মূলক কাজ করেছিলেন সেগুলিকে যদি এভাবে ভাগ করে আলোচনা করি—

মানুষের আত্মীক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র গঠন।

শারীরিক সুস্থতার জন্য বিধি ব্যবস্থা দিতেন।

পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল করার জন্য কর্ম প্রণালীর শিক্ষা।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে যে সকল ভক্ত মানুষ গ্রামে সমাজে প্রচার করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে প্রসার করেছিলেন তারা সেই সময়ের এক একজন মহাধর্মবান মানুষ ছিলেন। অগণিত মানুষের মধ্যেও হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মগত ভক্তদের নাম না করলেই নয়। যারা তারা প্রত্যেকেই 'মতুয়া' ধর্মে কেউবা পাগল কেউবা গোঁসাই কেউবা ঠাকুর আখ্যায় ভূষিত ছিলেন মানুষের কাছে তাদের কর্মের দ্বারা। এই মানুষগুলি হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেই তাদের জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মানুষেরা হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মবিক্রিত হয়েছিলেন কোন না কোনভাবে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণকারী মানুষ। এরা হলেন—ক. গোলক গোস্বামী, খ. হীরামন গোস্বামী, গ. লোচন গোস্বামী, ঘ. দশরথ বিশ্বাস, ঙ. মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, চ. বদন ঠাকুর, ছ. গোলক কীর্ত্তনীয়া, জ. তারকচন্দ্র সরকার, ঝ. দশরথ বৈরাগী। এরা সকলেই ছিল মহাসাধু যারা ধর্ম-কর্ম সাধনার দ্বারাই ব্যক্ত হয়েছিলেন। এই মানুষগুলি হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক এবং এরা হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে 'হরিনাম' প্রচার করেন এবং তাঁর আর্দশগত মতকে মানুষের মাঝে প্রচার করে আত্মীক উন্নতির সঙ্গে রোগ নিরাময় ব্যবস্থা দিতেন যাতে মানুষের শারীরিক ব্যাধিও মুক্ত হওয়ার জন্য। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকে যারা বহন করতেন তাদের নিয়েই সার্বিক কল্যাণ কথা আলোচনাও সকল ভক্ত মানুষকে নিয়েই চলতেন হরিচাঁদ ঠাকুর।

মানুষের আত্মীক উন্নতি ও নৈতিক চরিত্র গঠনে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা :

'মতুয়া' ধর্ম সম্প্রদায় একটি নব সম্প্রদায় রূপে বিভক্ত হয়ে দেখা দিল। সেই 'মতুয়া' নামে আখ্যায়িত ভক্ত মানুষগুলির প্রাণ পুরুষ হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে তারকচন্দ্র সরকার যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল—

''সর্ব্ব ধর্ম্ম লঙিঘ এবে করিলেন স্থূল।

শুদ্ধ মানুষেতে আর্ত্তি এই হয় মূল।।

জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।

ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।

এই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম্ম জানাইতে।

জনম লভিলা যশোবন্তের গৃহেতে।।"[৮]

মানুষের নিত্য কর্তব্য হিসাবে হরিচাঁদ ঠাকুর যে নিয়ম পালন করার নির্দেশ দেন তা জীবন গঠনের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশাবলী 'শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এবং এই দ্বাদশ আজ্ঞা প্রত্যেক 'মতুয়া' ভক্তের পালন করাই হল জীবন গঠনের মূল দিক। এছাড়াও অবশ্য পালনীয় কর্ম রয়েছে। যা মানুষকে আদর্শ গৃহ জীবন পালনের মধ্যেই ধর্মাচরণ করে মানুষ মহামানব পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। আলোচনা ক্রমে সকল দিকগুলিকে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরব।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের দ্বাদশ আজ্ঞা :

প্রথম আজ্ঞা : সদাসত্য কথা বলবে।[৯]

মানুষ হল এমন একটি জীব যার কথা বলার ভাষা আছে, লিখবার ক্ষমতা আছে। সেই মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে পূর্ণতা পাওয়ার জন্য সর্বদাই সক্রিয় হতে হয়। আর মানুষ জন্মানোর এক বছর বয়স থেকে তার কথার মাধ্যমে তার অভিমত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়। সেই বাল্যকাল থেকেই তাকে সত্য বলার মধ্যে বড় করলে তার জীবন সত্যের আদর্শেই গড়ে উঠবে। মানুষের জীবনের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে সত্য বলার অভ্যাস থাকলে জীবন সত্যের জ্ঞান আলোক দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। সত্য কথা, সৎ কর্ম এবং সৎ পথে চলা মানুষের মানবিক মেরুদণ্ড স্বরূপ।

দ্বিতীয় আজ্ঞা : পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান করবে।[১০]

হরিচাঁদ ঠাকুর এই দ্বিতীয় আজ্ঞায় পুরুষ চরিত্রকে যথার্থ পুরুষ হওয়ার কথা বললেন। মানুষের যৌবনকালটাই যেমন কর্ম বিকাশের যথার্থ সময় তেমনি এই সময় আবার 'কাম' বা 'কামনা' চরিতার্থরও আদর্শ সময়। তাই পুরুষের চরিত্রকে কলুষতা মুক্ত করতেই তিনি বললেন পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান করতে।

অপরদিকে যদি কথাটিকে এভাবে আলোচনা করি তাহলে সমাজ জীবনে নারীরও যথার্থ কর্তব্য রয়েছে। একজন নারীও যদি নিজ স্বামী ছাড়া অন্যকে পিতৃ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করার

কথা ভাবে তাহলে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই পূর্ণ যৌবনের ভোগাকঙ্খা থেকে মুক্ত হয়ে যথার্থ মনুষ্যত্ব বোধের স্তরে পৌঁছাতে সম্ভব হবে। যৌবনে কর্মময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে ও পুরুষ ও নারী যথার্থ মানব চরিত্রের উপযোগী হবে।

তৃতীয় আজ্ঞা : পিতা মাতাকে ভক্তি কর।[১১]

হরিচাঁদ ঠাকুর এই কথার মর্মার্থ এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''পিতা-মাতা গাছের গোড়া হরি গাছের ফল
গাছের গোড়ার জল না দিয়া কোথায় ঢালো জল।''

সন্তান মাতা পিতার আদরের ধন। সন্তানের শুভ চিন্তাকারী, শুভ কর্মকারী মানুষ প্রথমেই বাবা ও মা। তাই বাবা-মাকে শ্রদ্ধা সন্তানের সহজাত কর্ম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পিতা-মাতা বাল্যকালের থেকে বৃদ্ধ হলেও মা বাবার কাছে ছোটই থাকে। তাই সন্তানের বড় হয়ে বাবা মাকে যথোপযুক্ত ভাবে পালন করাও স্বধর্ম পালনের মধ্যেই পড়ে। আর বাকি রইল ধর্ম জীবন পালন করার কথা। একথাই তো সর্বাংশেই সত্য যে মা-বাবা বড় করেছে তার পরই সে ধর্ম জীবন পালনের জন্য উপযুক্ত হওয়ার জন্য। তখন যদি ধর্ম জীবন পালনের মত অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হয় মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য পরায়ণ তাহলে জীবন যথার্থভাবেই অর্থবহ হয়। আর বড়দের শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান জানালে সমাজে বয়স্ক ও ছোটদের মানবিক বোধের পরিচয়টিও ধরা পড়ে।

চতুর্থ আজ্ঞা : জগতকে প্রেম কর।[১২]

জগত বলতে মা বসুমতিও তারপর বসবাসকারী গাছপালা তথা উদ্ভিদ জগত ও জীবজগতকে বোঝায়। জগতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হল মানুষের কর্তব্য। একটি সাধারণ জ্ঞানের কথা হল আমরা যে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করি সেই পরিবেশে অনেক গাছপালা পশুপক্ষি বাস করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আবশ্যক। তাই জগতে একমাত্র মানুষের প্রতিই নয় সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া মানুষের কর্তব্য। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর বলেছেন জগতকে প্রেমদান কর। এবং সর্ব্বপরি বলা যায় মাটির প্রতিও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হওয়া উচিত।

পঞ্চম আজ্ঞা : চরিত্র পবিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতি ভেদ করো না।[১৩]

চরিত্রই মানুষের মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটে চরিত্রকে কেন্দ্র

করে। চরিত্রই ব্যক্তিগত পরিচায়ক যেমন তেমনি একজন আদর্শ মানুষ সেই জাতীর গৌরব বহন করে এবং বৃহৎ অর্থে সেই চরিত্রাদর্শই সমগ্র মানুষ জাতির ঐতিহ্যবহন করে। মানুষের কর্তব্য জাতিভেদ প্রথার দ্বারা কোন একটি জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়। তাতে মানুষের ব্যক্তি চরিত্র কলুসিত হয় ও সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় পায়।

ষষ্ঠ আজ্ঞা : কারো ধর্ম নিন্দা করো না।[১৪]

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল ধর্ম। ধর্মকে মানুষ ধারণ করে। মানুষ ধর্মকে ধারণ করে আত্মীক উন্নতি ঘটায়। এবং ধর্ম জীবন পালনের দ্বারা মানুষ নিজের আত্মদর্শন ঘটিয়ে মানুষের জীবনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। একথা যে কোন ধর্ম সম্পর্কেই বলা যায়। তাই ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সাধন। তাই কোন মানুষ ধর্ম জীবন পালন করছে তাকে নিন্দা করা কখনোই উচিত নয়। এটা মানবতাবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা মানুষকে সংযমী হতে শেখায়।

সপ্তম আজ্ঞা : বাহ্য অঙ্গ সাধু সাজ ত্যাগ কর।[১৫]

হরিচাঁদ ঠাকুর সাধু সাজতে বলেন নি। সাধু হতে বলেছেন। সাধু হতে গেলে অন্তর শুদ্ধ করতে হয় আর অন্তর যদি পবিত্রময় থাকে তাহলে বাইরে কোন বিশেষ পোষাক না পরেও সাধু চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। তাই মানুষকে বাইরের সাধু সাজের ত্যাগের কথা বলেছেন। কিন্তু অন্তর শুদ্ধ হয়ে সত্যের দ্বারা জীবন যাপনের কথা বলেছেন।

অষ্টম আজ্ঞা : হাতে কাজ মুখে নাম করবে।[১৬]

মানুষতো মুখেই কথা বলে। হাতের দ্বারা কাজ করে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে 'হরিনাম' করার কোন একটি নিদৃষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেননি। আর মানুষকে সর্বদাই কর্মময় থাকতে হয় তাই কর্ম করে হাতের দ্বারা মুখটি থাকে চুপ করে। তাই কর্মের সময় হাতের কর্মের সহযোগে মুখের দ্বারা 'হরিনাম' করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে 'হরিনাম' করাও হল আবার গৃহকাজ বা যে কোন কাজটি ও সম্পন্ন হল। ফলে 'হরিনাম' করার জন্য আলাদা করে সময় নষ্ট করতে হয় না।

নবম আজ্ঞা : শ্রীশ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা কর।[১৭]

ধর্ম পালন করে মানুষ। তাই আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের হৃদয়ে যদি শ্রীশ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে জগৎ থেকে অজ্ঞান তামসিকতার বিনাশ ঘটে

মানুষের জীবন পূর্ণ মানবতাবোধের জ্ঞানের আলোক পূর্ণ হয়ে সত্য সুন্দর হয়ে বিকশিত হবে।

আর বাড়িতে শ্রীশ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠার ফলে মানুষের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মনুষ্য জীবনের মহামূল্যবান সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়।

দশম আজ্ঞা : ষড়রিপু থেকে সাবধান থাকবে।[১৮]

ষড়রিপু হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। এরা মানুষের দেহকে পরিচালনা করে। মানুষের কর্তব্য হল এই পরিচালকগণকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করার ক্ষমতা অর্জন করা। তাই ধর্ম পালন বা 'হরিনাম' মাহাত্মের দ্বারা সর্বদাই জ্ঞান ভক্তির দ্বারা এই ষড়রিপু গুলিকে ঊধ্বমুখী করে মানুষের জীবনকে চালনা করা। এই ষড়রিপু বা ষড় ইন্দ্রিয়কে জয় করে জিতেন্দ্রীয় হয়ে মানুষের জীবন যাপন করাতেই মানুষের মনুষত্বের বিকাশ হয়।

একাদশ আজ্ঞা : দৈনিক প্রার্থনা কর।[১৯]

মানুষের হৃদয়কে নির্মল পবিত্র রাখার বা চিত্ত স্থির করার একমাত্র উপায় দৈনিক ভগবানে প্রার্থনা করা। প্রতিনিয়ত যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয় তাহলে মানবাত্মার শক্তির বিকাশ ঘটে। যা বিখ্যাত মানবাত্মার প্রতীক। নিত্য প্রার্থনায় আত্মদর্শন ঘটে এবং ভগবানের সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান লাভ হয়। এবং মানুষের জীবন জ্ঞান ভক্তির মেলবন্ধন ঘটে মানুষ পূর্ণ হয়।

দ্বাদশ আজ্ঞা : ঈশ্বরকে আত্মদান কর।[২০]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ঈশ্বরে বা ভগবানে আত্মদান করতে বলেছেন। ভগবানে আত্মদানের মাধ্যমে নিজেরই আত্মচৈতন্যের জাগরণ ঘটে। আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষই সমাজের প্রকৃত মানবসত্তার অধিকারী। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ভগবানের চিন্তা কর্ম করতে গেলে প্রথমেই আত্মশুদ্ধ হতে হয়। আত্মশুদ্ধ হলে মানুষ নিজ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় আস্তে আস্তে। এ ভাবেই মানুষের চরিত্রকে আত্মীক উন্নতির পথে গমন করতে হয়। ভগবানে আত্মদান করলে ভগবান ও মানুষকে নিজ গুণে যদি আত্মদান করে তার স্বরূপকে জ্ঞাত করান তাহলে মানুষের জীবন ধন্য হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম পালনের এবং গৃহজীবনের উন্নতির জন্য যে নিয়ম ও কর্মাদর্শকে নিজে পালন করেছেন ও সকল মানুষকে জীবনে সেই নীতি আর্দশ পালন করে আর্থিক উন্নতি করার কর্ম করতে বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহস্থ জীবন পালন করার মধ্যেই ধর্ম পালন করার শিক্ষাদান করেছেন। এক্ষেত্রে হরিচাঁদ ঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলা যায় তিনিও আদর্শ গৃহকর্ম পালন করেছেন এবং পরিবার জীবনে থেকেই তিনি সকল মানুষের কল্যাণের জন্য ধর্ম জীবন ও কর্মজীবনকে এক সংসার জীবনের সঙ্গে পালন করার রীতিকে প্রচলন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেও ছিলেন এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের প্রতিনিধি। কৃষি ভিত্তিক কাজকর্ম ছিল তার নখদর্পণে যেমন তেমনি তিনি জানতেন যে কৃষি ও ব্যবসার দ্বারা মানুষ অর্থ উপার্জন করে দারিদ্রের হাত থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। আর চরিত্র যদি সৎ আদর্শবান হয় তাহলে ভগবান সম্পর্কে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়াও অত্যন্ত সহজ হবে। যা সকল মানুষের জন্যই প্রয়োজনীয়তা বহন করে সমান ভাবে। সংঘবদ্ধতা মানুষের সমাজের তথা মানব মৈত্রির যোগ সূত্র সেই জন্য তিনি নিজেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। 'হরিসংকীর্ত্তন' 'হরিবাসর' করার মধ্যে দলবদ্ধভাবে কীর্ত্তন করার প্রথাকে প্রচলন করেন এবং সমবেত ভাবে 'হরিনাম' অর্থে বহুক্ষণ ব্যাপি 'হরিবল' নাম একত্রে করতেন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। যা মহাসংকীর্ত্তন নামে বা 'মহানাম' নামে পরিচিত। আর দলবদ্ধভাবে চলার নির্দেশ দিতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর আদর্শ গৃহধর্ম শিক্ষার জন্য যে কাজ তিনি নিজে করেছেন ও সকল ভক্ত মানুষদের শিক্ষা দিয়েছেন তাকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার সহ আরও অনেক লেখকগণ। কিন্তু কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারই শ্রীশ্রীহরিঠাকুরের সমগ্র জীবনীকে ও কার্যাবলীকে সুসংহত আকর গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকেই সমগ্র হরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীকে গ্রহণ করছি। হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহধর্ম ভাবনার যে পরিচয় পাই তা হল—

.....

''প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম জীবে শিক্ষা দিতে।
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হল অবনীতে।''[২১]

এরপর গৃহীকে কি কাজ করতে তিনি বলেন তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে গৃহধর্ম পালনের সময় নিজেই কৃষক হয়েছেন, ব্যবসায়ী হয়ে

ব্যবসা করেছেন, এবং সর্ব্বপরি মানুষের সঙ্গে নিজেই হরি প্রেমে মত্ত হয়েছেন। এই সকল কাজই মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতির উপায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহ ভাবনাটিও মানুষের প্রতি এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে—

"সর্ব্ব কর্ম্ম করা ভাল গৃহীজন পক্ষে।
গৃহস্থের করা ভাল সর্ব্ব কার্য শিক্ষে।"[২২]

গৃহকে পরিপূর্ণ শান্তির আগার করে গড়ে তোলার জন্য গৃহী মানুষকে সকল কাজ শিখে রাখার প্রয়োজন হয়। কেননা কখন কোন কাজ করতে হবে কাজ শিখে রাখলে প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ করে নেওয়া যায় নিজের শেখা দক্ষতায়।

বাংলার মানুষ অধিকাংশই পল্লীর অধিবাসী। আর গ্রাম বাংলার আজও প্রধান কাজ কৃষিকাজ। তাই তিনি সমস্ত কাজকে গুরুত্ব পূর্ণভাবে করতে বলেও কৃষিকাজকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময়ে মানুষের কৃষির জন্য কম-বেশি সকলেরই ধানের জমি ছিল এবং বাঙালি জাতির প্রধান খাদ্যশষ্য হিসাবে আজও পরিচিত হল ভাত ও মাছ ডাল ও নানা প্রকারের সব্জি যা তৎকালীন সময়ে কৃষিকর্মের দ্বারা প্রত্যেকের উৎপাদন করা সম্ভব ছিল। হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহভাবনার দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় যে মানুষের জীবনে অন্যতম উপাদান খাদ্য সেই খাদ্যের কোন অভাব থাকবে না কৃষির উৎপাদন যত্নসহকারে করলে, তাই তিনি বলেন—

"সর্ব্বকার্য্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য্য হয়।
এ কার্য না করা আমাদের ভাল নয়।।"[২৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃষিকার্য থেকে বোঝা যায় তিনি সত্যিই প্রকৃত কৃষক। আর তিনি কৃষির উন্নতির জন্য যেমন পতিত জমিকে বেছে নিয়ে চাষযোগ্য করে সোনার ফসল ফলিয়েছেন। তেমনি ভাবে মানুষকেও নিয়েছেন ধর্ম শিক্ষার জন্য যারা সমাজে পতিত মানুষ হিসাবে পরিচিত সেই মানুষের মাঝেও সূক্ষ্ম সনাতন ধর্মকে দিয়েছেন। যাতে মানুষের জীবনেও সোনার ফসল ফলার জন্য অর্থাৎ সর্ব্বভাবে মানুষকে জীবনের পূর্ণ মানবসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে। হরিচাঁদ ঠাকুরের এই কর্ম প্রণালীর যথার্থ প্রয়োগ করেছিলেন তা আলোচনার মধ্যেই পাওয়া যায়। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বর্ণনাতে পাই—

.....

''একবন্দ জমি দুই বিঘা পরিমাণ।

বহুদিন সে জমিতে নাহি হয় ধান।।

সব জমি মধ্য হতে লোনা উথলিয়া।

বুনাইলে ধান্য যায় করাটে হইয়া।।

চারিবর্ষ সে জমিতে হাল চাষে নাই।

সেই জমি চাষ কর্ত্তে লাগিল গোঁসাই।।

লোকে বলে এ জমিতে ধান্য নাহি ফলে।

বৃথা পরিশ্রম প্রভু কর কিবা বলে।।

এত শুনি হাসি মুখে কহেন গোঁসাই।

অফলা জমিতে আমি সুফল ফলাই।।

যশোবন্ত পুত্র আমি নাম হরিচাঁদ।

এবার করিব যত পতিত আবাদ।।''[২৪]

হরিচাঁদ ঠাকুর পতিত জমিকে চাষযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে তবে তিনি ধান চাষ করলেন সেই জমিতে ধান হল অতি উৎকৃষ্ট। আর পূর্ব বাংলার এখনকার বাংলাদেশের কৃষকগণ একসঙ্গে দু'ধরণের ধান চাষ করতেন। আউস ও আমন ধান। হরিচাঁদ ঠাকুরও এক সঙ্গে দু'ধরণের ধান বুনলেন ও ফসল তুললেন গতানুগতিক কৃষকের থেকে অনেক বেশি। সেকথা ব্যক্ত করেন কবি এভাবে—

''আউস হইল আর হইল আমান্য।

দুই বিঘা জমিতে দ্বিগুণ হইল ধান্য।।''[২৫]

এই ধান চাষ প্রসঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুর যে জ্ঞান গভীর তত্ত্বকথা বলেছেন তাতে মানুষের জীবনের উন্নতির গূঢ়ার্থ ব্যক্ত হয়েছে। এবং মানুষের গৃহজীবনের মধ্যেই ধর্ম জীবনকে মিল করানো সম্ভব ও গৃহ ধর্ম ও ধর্মচর্চাকে একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই পালন করার শিক্ষা দিলেন। জমি পতিতে ফসল ফলালেন ও মানুষ পতিতের জীবনেও ধর্ম জীবন পালনের দ্বারা পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় সেই পথের সন্ধান দিলেন। আর পতিত থেকে যে উদ্ধার কার্য করে তাকে চিনতে বললেন। অর্থাৎ ভগবানকে ভক্তি দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা আত্ম উপলব্ধি করে চিনে নিলে মানুষের কোন বিপদ হয় না সেকথাই বলেছেন। আবাদকারী সেই ভগবানের

সন্ধান পেলে মানুষের জীবনে সর্ব্বময় সৌন্দর্যের বিকাশ সম্ভব হয় একাগ্র ইচ্ছার দ্বারা। সব শেষে একথা বলা যায় একাগ্রভাবে সংসার জীবনে কর্মের দ্বারা যেমন সাফল্য লাভ করা সম্ভব তেমনিভাবে একান্ত আপনার জন ভেবে ভগবানের স্মরণাগত হলে তিনি তাঁর স্বরূপ নিজে জ্ঞাত করিয়ে দেবেন এবং জীবনের মূল লক্ষ্যে নিয়ে যাবেন। সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতে'র এই কয় ছত্র কবিতায়—

''এদেশে আবাদী তোরা চিনিলিনা কেহ।
মাটি যে অফলা থাকে এবড় সন্দেহ।।
পতিত আবাদ জন্য আশা এ দেশেতে।
কি ফল ফলিবে টের পাবি ভবিষ্যতে।।
খাঁটি মাটি হলে ফল না হয় বিফল।
ভক্তি করে ডাকে তারে দেই প্রেম ফল।।
যে ফল চাহিবি তোরা সে ফল পাইবি।
কল্প বৃক্ষ মূলে যদি প্রার্থনা করিবি।।
সফলা নগরী রই যে চাহে যে ফল।
বিফল না হয় ফল সে পায় সে ফল।।''[২৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর সংসারী মানুষের জন্য কোন আদর্শ দান করেন। এবং কি ধর্ম নিয়ে নিজে জীবন যাপন করেন এবং তিনি যে ধর্মাদর্শ কর্মাদর্শকে ভক্ত মানুষের সমাজে প্রচার করেন তার তালিকাটি হল এইরূপ—

.....
''হরিচাঁদ অবতীর্ণ নামধর্ম্ম নিয়া।।
.....
বজ্রস্বরে ঘরে ঘরে হরিচাঁদ কয়।
..... আর নাহি ভয়।।
সংসারে সংসারী থাক তাতে ক্ষতি নাই।
চরিত্র পবিত্র রাখি সত্য বলা চাই।।
গৃহ ধর্ম রক্ষা করো বাক্য সত্য কও।

হাতে কাম মুখে নাম দেল খোলা হও।।

অসতের সঙ্গ ছাড়ি হরি হরি বল।

কুফল বিফল হবে পাবে প্রেমফল।।

পুরুষে করিবে ভক্তি পিতা মাতা ভাই।

নারী পক্ষে পতি ভিন্ন অন্ন গতি নাই।।

পরপতি পরসতী স্পর্শ না করিবে।

না ডাক হরিকে হরি তোমারে ডাকিবে।।

গৃহ ধর্ম্ম গৃহ কর্ম্ম সকলি করিবে।

হাতে কাম মুখে নাম ভকতি রাখিবে।।

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।

যোগী, ন্যাসী, কি সন্ন্যাসী কেহ তুল্য নয়।।

গৃহেতে থাকিয়া যাঁর হয় ভাবোদয়।

সেই যে পরম সাধু জানিও নিশ্চয়।।

তারস্বরে প্রভু সবে এই ভীর দিল।

রোগী ভোগী দুঃখী পাপী সকলি আইল।''[২৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেই আত্মদর্শী মানুষ ছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজেই গৃহধর্ম্ম রক্ষা করেছেন পরিপূর্ণভাবে এবং যে আদর্শ নিজে পালন করেছেন সেই জ্ঞান ও ভক্তির পথকে সমাজের সকল মানুষকে পালন করতে বলছেন। আর ভক্তি পথে তিনি ছিলেন অকামনা প্রেমভক্তির অধিকারী। হরিচাঁদ ঠাকুর এই ভক্তি পথের সন্ধান দেন ভক্তগণকে এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে অনেক অকামনা প্রেমভক্তির ভক্ত মানুষের আগমণে হরিচাঁদ ঠাকুর বহু ভক্ত মানুষের মধ্যে নিজের সত্তাকে খুঁজে পেয়ে একদেহ ধারী হয়েও বহু ভক্ত দেহে অনেক শক্তির অধিকারী হলেন। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনায় হরিভক্তির আদর্শ এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

.....

''আপন আত্মাকে হরি আপনি দেখিল।

কত লীলা করে হরি চটকার তলা।।

কল্প বৃক্ষ মূলে বসে শ্রীহরি ঠাকুর।

অকামনা, নামে রুচি কামবাঞ্ছা দূর।।

অকামনা বৃক্ষমূলে মিলে সর্ব্বফল।

অকামনা ব্রত সাধে ভকত বৎসল।।

একা প্রভু বহু হল ভকতের দেহে।

ভক্তি আকর্ষণে চলে ভক্তগণ গৃহে।।''[২৮]

ভক্ত মানুষ সহযোগে হরিচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠন :

'দেশ ভরি শব্দ মধুর মধুর। যশোবন্ত ছেলে হরি হয়েছে ঠাকুর।' 'ঠাকুর' হয়েছে শব্দ শুনে বহু মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনে এসে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কেউবা এল রোগ হতে মুক্ত হবার জন্য। আবার কেউ বা এল অন্তরের গভীর সন্ধানের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে। এভাবে হরিভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসেন ও অভিষ্ট পুরণ হওয়ার পর আত্মসমর্পণ করেছিলেন বহু ভক্ত। হরিচাঁদ ঠাকুর এই ভক্তগণের মনবাসনাকে পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। তারা সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রিয় ভক্তেও পরিণত হলেন। এবং সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের মতাদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে ব্যক্ত করেন তৎকালীন সমাজ মানুষের কাছে। আলোচনার মাধ্যমে দেখব কোন ভক্ত কীভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শকে মানুষের সমাজে প্রচার করেছিলেন।

প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের আত্মসমর্পণ কাহিনিটি আলোচনা করা যাক। মল্লকাদি গ্রামে বাস করতেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। 'অথ মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের উপাখ্যান' অংশে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন শাস্ত্র জ্ঞান সম্পন্ন একজন জ্ঞানীভক্ত। তার শরীরে রসপিত্ত ব্যাধির জন্য আত্মধিক্কার জন্মে যে আমার পিতামাতা পরম ভক্ত তাদের সন্তান হয়ে আমার এহেন ব্যাধি হল। আমি আমার জীবন ত্যাগ করবো কিন্তু জীবন ত্যাগের জন্য বিষ সংগ্রহ করেন এবং মনে মনে ভাবলেন ওড়াকাঁন্দি হরি অবতার রূপে ব্যক্ত হয়েছেন। তখন মৃত্যুর আগে হরিদর্শন করলে মৃত্যুর পর হরি পাব। এই সংকল্প করে হরিদর্শনে যান বিষ নিয়ে। এই বর্ণনাগুলি তারকচন্দ্র সরকার মহাশয় এভাবে জানালেন—

''মল্লকাদি গ্রামে মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ।

যেভাবে ঠাকুর প্রতি বাড়ে অনুরাগ।।

.....

শাস্ত্র শ্লোক বক্তা ছিল ধীর অতিশয়।।

শাস্ত্র আলাপনে অতি ছিলেন সমর্থ।

করিতেন শাস্ত্রের মাঝেতে নিগুঢ়ার্থ।।

সাধু সঙ্গে ইষ্ট গোষ্ঠ করে নিরবধি।।

দৈবেতে হইল তার রসপিত্ত ব্যাধি।।

.....

আমার এ ব্যাধি হল না রাখিব প্রাণ।।

কোন মুখে এই মুখ লোকেরে দেখাব।

ভাবিলেন বিষ খেয়ে জীবন ত্যজিব।।

ওড়াকাঁদি হল হরি ঠাকুর প্রচার।

.....

এদেশ এ গ্রাম সব ধন্য হইয়াছে।

আমিও যাইব সেই ঠাকুরের কাছে।।

.....

জ্ঞান হয় ওড়াকাঁদি স্বয়ং অবতার।

তিনি বিনে পতিতের বন্ধু নাহি আর।।

.....

ওড়াকাঁদি হতে প্রেম বন্যা উথলিল।

আমি বিনে জগতের সকলে ডুবিল।।

মরিলে ঠাকুর দেখে পরকাল পাব।

শেষে বিষ খেয়ে আমি আত্মঘাতী হব।''[২৯]

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েই ওড়াকাঁদি গমন করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে। হরিচাঁদ ঠাকুর তার দূরদর্শিতার পরিচয় দেন গোপন করা বিষকে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের কাছ থেকে নিয়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন। এবার মৃত্যুঞ্জয় মহাশয়ের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হচ্ছে

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলছেন অন্তর্যামী ইনি। হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান বলে বিশ্বাস করলেন। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাজও কথায় ব্যক্ত হয় গভীর আত্ম প্রত্যয় শক্তির পরিচয়। এখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসকে রক্ষা করলেন বিষ পানের কবল থেকে। আর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের যে মৃত্যু ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছিলেন সেই মনোবাসনাকেও ঠাকুর পূর্ণ করেন। অর্থাৎ ভক্ত মৃত্যুঞ্জয়কে আত্মসমর্পণ করান হরিপদে। এভাবেই ভগবানের সাথে ভক্ত মহাভাগ মৃত্যুঞ্জয়ের মিলন হল। কবির বর্ণনায়—

.....

‘‘বিষ লয়ে ওড়াকাঁদি উপনীত হল।
প্রভুর নিকটে গিয়া কাতরে বসিল।।
প্রভু বলে মৃত্যুঞ্জয় এলি ওড়াকাঁদি।
পরিধান কাপড়েতে কি আনিলি বাঁধি।।
অমনি বিস্ময়ান্বিত হল মৃত্যুঞ্জয়।
মুখ পানে চেয়ে রল কথা নাহি কয়।।
বসন টানিয়া প্রভু বিষ খসাইল।
বাহির করিয়া নিজে বিষ পান কৈল।।
এলি এই বিষ খেয়ে মরিবার তরে।
ওড়াকাঁদি এলে কিরে বিষে লোক মরে।।
এই বিষ খেয়ে বাছা মরিতে কি তুমি।
এই তো খেলাম বিষ মরিতনা আমি।’’[৩০]

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের মরবার ইচ্ছাকে ‘হরিচরণে’ সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে তাকে তার কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে হরিচাঁদ ঠাকুর মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুঞ্জয়ী করলেন। কবি বলছেন এভাবে—

‘‘গোপনে রেখেছি কিসে পাইল সন্ধান।
অন্তর্যামী ইনিত স্বয়ং ভগবান।
প্রভু কয় মৃত্যুঞ্জয় শুনরে বচন।
বিষ খেয়ে মরে যে সে মানুষ কেমন।।

নিজ দেহ প্রতি যার দয়ামায়া নাই।

সে ভাল বাসিবে পরে বিশ্বাস না পাই।।

মৃত্যুঞ্জয় কহে প্রভু তোমার সাক্ষাতে।

মরিব বিষের বিষে ভয় কি তাহাতে।।

প্রভু বলে যদি তোর মরিবার ইচ্ছে।

মরিলিত ভাল করে মর মোর কাছে।।''[৩১]

এরপর প্রভুপদে আত্মসমর্পণ করেন মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। কবির বর্ণনায়—

.....

''পড়ে পদে মনোখেদে বলে মৃত্যুঞ্জয়।

দোষ ক্ষমা করি প্রভু রেখ রাঙ্গা পায়।।

দীন দয়া ময় দয়া কর এক বার।

আমিও তেমার প্রভু এ দেহ তোমার।।

প্রভু বলে যদি মোরে দেহ দিলি ধরি।

ব্যাধি মুক্ত হল তুই বল হরি হরি।।

শ্রীনাথ শ্রীমুখ বাক্য যখন বলিল।

ব্যাধি মুক্ত মৃত্যুঞ্জয় নাচিতে লাগিল।।

মৃত্যুঞ্জয় ধরি হরি চরণ যুগল।

বলে হরিবল হরিবল হরিবল।।

মৃত্যুঞ্জয় পাইল প্রভুর শ্রীচরণ।

কহিছে তারক হরিবল সর্ব্বজন।।''[৩২]

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের যে মৃত্যু ইচ্ছা ছিল সেই মৃত্যু ঘটিয়েছেন তার মানষিক ব্যাধির যেমন তেমনিভাবে শারীরিক ব্যাধির ও মুক্তি দিয়ে তাকে নিজের করে নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিভক্তি থাকলে ভক্তপ্রাণে মৃত্যু আকাঙক্ষা থাকে না একথাও ব্যক্ত করলেন নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুর। আর মৃত্যুর পর হরি পাওয়ার আকাঙ্খা ছিল ভক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের হরিচাঁদ ঠাকুর ইচ্ছা পূর্ণ করেন, মৃত্যুর পর নয় আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরকে পেলেন ভক্তসাধক মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। জীবিত থেকেই হরি পান। এই মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসই পরবর্তী সময়ে হরিনাম প্রচার

করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে।

বদন ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শন করে কেমন করে হরিভক্ত হলেন তার পরিচয় গ্রহণ করব। বদন ঠাকুর গোলক পাগলের কাছে যাতায়াত করত তখন থেকেই হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শের দ্বারা আকৃষ্ট হন। পরে তার বিষম পেটে ব্যথা হয় এবং আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করার ফলে আরো বৃদ্ধি পায় ব্যথা এবং আরো রোগ বৃদ্ধি পায়। বদন ঠাকুরের শারীরিক পরিস্থিতি এতটা অবনতি ঘটে যে মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়ায়। এই শারীরিক পরিস্থিতিতে অনেকে হরিনাম করার পরামর্শ দেন এবং সমস্ত রোগের আরোগ্য কর্তা অর্থাৎ ভগবানের স্মরণাগত হওয়ার পরামর্শ দেন ও বলেন ওড়াকাঁন্দি ঠাকুরের কাছে চল তিনি বাঁচালে বাঁচাতে পারেন। শুনেই বদন ঠাকুর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। সকলে মিলে নৌকায় নিয়ে যান ওড়াকাঁন্দি। ওড়াকাঁন্দি যাওয়ার সময় মনোবাসনা প্রকাশ করেন যে যদি কিছু সময় পেতাম মনোসাধ মিটায়ে নিতাম হরিনাম। অসুস্থ বদন ঠাকুরকে ঠাকুরবাড়িতে আনলে হরিচাঁদ ঠাকুরের গৃহ মধ্যে চলে যান। অসুস্থ ঠাকুর ঠাকুরবাড়িতে বসে হরিনাম করতে থাকেন ও হরিচাঁদ ঠাকুরকে একমনে স্মরণ করেন। অসুস্থ ভক্তের হৃদয়ার্তিতে ঠাকুর প্রীত হন ও বাইরে এসে তার উপর অনেক ভৎর্সনা করেন ও সকলকে বাড়িতে পাঠান, বলেন তোরা বাড়িতে গিয়ে বল বদন ওড়াকাঁন্দি গিয়ে মারা গেছে। সকলকে বাড়িতে পাঠিয়ে চিকিৎসায় সুস্থ করে তোলেন বদন ঠাকুরকে। বদন ঠাকুরকে আত্মসম ভালোবেসে নিজের করে নিলেন। এভাবেই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে বদন ঠাকুর আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হনও হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায় 'হরিনাম' দান করেন ও রোগের আরোগ্য ব্যবস্থাও করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশানুসারে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার বর্ণনা করেছেন এভাবে—

''গোলক পাগল হল ঠাকুরের ভক্ত।
ভক্তি ভাবে আত্মহারা সদাই উন্মত্ত।।
.....
অনুক্ষণ আসে প্রভু গোলকের ঠাই।
ক্রমে প্রেমে ভাবাবিষ্ট বদন গোঁসাই।।
.....
হইল অসাধ্য ব্যাধি উদরে বেদনা।

অহরহ বেদনায় বিষম যাতনা।।

.....

একেত ঘায়ের ব্যথা, ব্যথা পুরাতন।

উভয় ব্যথার জ্বালা নাহি নিবারণ।।

ক্রমে বৃদ্ধি বেদনাতে অস্থিচর্ম সার।

অদ্য কিম্বা কল্য মৃত্যু এরূপ আকার।।

কেহ বলে চিকিৎসায় নাহি প্রয়োজন।

কেহ বলে বৈদ্যনাথ প্রতি দেহ মন।।

.....

কেহ বলে বাঁচ যদি ওড়াকাঁদি চল।।

জগত জীবন তিনি জগতের কর্ত্তা।

মরিলে বাঁচাতে পারে সবে কহে বার্ত্তা।।

আত্মস্বার্থ সমর্পণ করহ তাহায়।

.....

সবে বলে মোরে লয়ে ওড়াকাঁদি চল।।

.....

ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক অজ্ঞান।।

উত্থান শকতি নাই থাকেন শয্যায়।

তরণী সাজিয়া চলে দুই মহাশয়।।''[৩৩]

মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষের মনে আশা থাকলেও উপায় থাকে না। এ চিরসত্য কথা চিরকালের মহাসত্য, মানুষের জীবনে। এ সত্য থেকে বদন ঠাকুরও ব্যতিক্রম নন। আর মানুষের জীবনে আর একটি মহাবাক্য মহাসত্যের সঙ্গে বদন ঠাকুরকে পরিচয় করান তা হল মানুষ এই জগতে একাই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে আর একাকেই কর্ম দ্বারা এজগতে জীবন ধারণ করতে হয়। কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করে ভগবানকে চিনতে হয় ও মানুষকে পূর্ণ মনুষত্বের স্তরে উন্নীত হতে হয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের স্তরে পৌঁছাতে একমাত্র উপায় 'হরিনাম' ও শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ করলে ভগবান স্বয়ং আত্মসমর্পণকারীকে আত্মগত

করে নেন ও তার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করান। হরিচাঁদ ঠাকুর বদন ঠাকুরকে সুস্থ করে তোলেন ও হরিনাম করার আদেশ দেন। কবির বর্ণনায়—

.....

''মনোসাধ মিটায়ে নিতাম হরিনাম।।

.....

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আসিল বাহিরে।

তর্জ্জন গর্জ্জন করে বদনের পরে।।

গালাগালি দিয়া বলে উঠ বেটা দুষ্ট।

বল দেখি তোর কেন হল এত কষ্ট।।

.....

এখন সে সোর শব্দ রহিল কোথায়।

একা আসা একা যাওয়া সাথি কেবা হয়।''[৩৪]

এই ভক্ত মানুষের সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের যে কথপোকথন হয় তার মধ্যে গভীর জীবনদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। বদন ঠাকুরের অন্তিম সময়ের তীব্র জীবনাগ্রহকে নবভাবেই জাগ্রত করেন ঠাকুর হরিচাঁদ। হরিচাঁদ ঠাকুর বার বার ভক্তদের মৃত্যু আর্ত্তি শোনার পর বলেন ''মরিবি তো ভাল করে মর মোর কাছে' একথার একটিই অর্থ বোঝা যায় আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরাত্মা ভক্ত হওয়ার কথা বলেন। এই অসুস্থ ভক্ত মানুষের শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে পূর্ণভাবে জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করেন ও মানুষের জন্য কাজ করার যোগ্য করে গঠন করে নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। 'বদন মরেছে ওড়াকাঁন্দি' কথার অর্থ ওড়াকাঁন্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হয়েছে। বদন ঠাকুরের ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবালাপটি এভাবে প্রকাশ করেন কবি—

''বদন বলিছে প্রভু মরিয়াছি আমি।

ভগ্ন তরী ডুবে মরি কর্ণধার তুমি।।

ঠাকুর বলেন চিনে সে কাণ্ডারীধর।

মরিলি যদ্যপি বেটা ভাল করে মর।।

বদন বলেন মম ডুবু ডুবু তরী।

আর কি চিনিতে যাব চিনেছি কাণ্ডারী।।

বদন বলেন তরী সবে যায় বেয়ে।

ডুবা তরী যেই বাহে তারে বলি নেয়ে।।

বদন বলেন হরি পদ তরী দেও।

ছাড়িলাম দেহ তরী বাও বানা বাও।।

হরি হরি হরি বলি উঠিল বদন।

ধরণী লোটায়ে ধরে প্রভুর চরণ।।

.....

বাটী গিয়া বল সবে মরেছে বদন।

যে দারুণ পেট ব্যথা না রবে জীবন।।

কেহ যদি থাকে সে করুক শ্রাদ্ধ আদি।

বল গিয়া বদন মরেছে ওড়াকাঁদি।।

.....

ঠাকুর বলেন তোর পেটে ছিল যেই।

দেখ বাছা তোর পেটে আছে কিনা সেই।।

বদন বলেন মোর পেটে সেই ছিল।

শ্রীপদ পরশে সেই মুক্তি পেয়ে গেল।।

হরিভিন্ন বদনে বলে না অন্য বোল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি বলেছে কেবল।।''[৩৫]

বদন ঠাকুরকে হরিচাঁদ ঠাকুর অনেকদিন পর্যন্ত নিজের কাছে রাখেন ও হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে আজ্ঞা দেন রোগারোগ্য করে ভক্ত মানুষকে শারিরীক ভাবে ও হরিনাম দানে মানসিকভাবে সুস্থ করে মানুষের উপকার করতে। সে কথা এভাবে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার ব্যক্ত করেছেন—

''প্রভু সঙ্গে বদন থাকেন একতর।

কভু ঠাকুরের বাড়ী কভু ভক্তঘর।।

কোন কোন লোক যদি হয় ব্যাধি যুক্ত।

ঠাকুরের কাছে আসে হতে ব্যাধিমুক্ত।।

কারু কারু আজ্ঞা দেন মুষ্টি যোগ করে।

কারু বলে লয়ে যাও বদন ঠাকুরে।।

ঠাকুর বলেন তবে বদন ঠাকুরে।

যেই তুমি সেই আমি একই শরীরে।।

.....

তুইরে বদন মম ধন মন প্রাণ।।

তোর দেহ নিলাম আমার ইচ্ছামতে।

তোর ইচ্ছা যাহা হয় মোর ইচ্ছা তাতে।।

ঠাকুরের আজ্ঞা শুনি বদন উঠিল।

ঘুরে ফিরে নাচে যেন মত্ত মাতোয়াল।।

.....

নাহি ক্ষান্ত অবিশ্রান্ত করে হরিনাম।।

ব্যাধিযুক্ত কেহ যদি হয় নিরুপায়।

কাঁদিয়া ধরিত গিয়া বদনের পায়।।

হরিচাঁদ বলিয়া দিতেন আজ্ঞা করে।

অমনি সারিত ব্যাধি আজ্ঞা অনুসারে।।''[৩৬]

বদন ঠাকুর নিজে শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি থেকে চিরমুক্ত হন হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায় এবং অগণিত মানুষেরও মুক্তির পথ দেখান হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে।

গোলক পাগলের কথা আলোচনা করার মধ্য দিয়ে দেখব হরিচাঁদ ঠাকুরও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তেরা কীভাবে তৎকালীন সমাজের মানুষের দুঃখ কষ্টের নিবারণ করতেন। আর গোলক গোস্বামী যেভাবে হরিচাঁদ পদে আত্মসমর্পণ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হন। সেই কথার তারকচন্দ্র সরকার পরিচয় দিয়েছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন— গোলক গোস্বামীর অখ্যান কথা সম্পূর্ণ ভাবে বলতে গেলে একটি অধ্যায় হয়ে যায়। ভক্ত গোলকের বাড়ি নারকেলবাড়ি গ্রামে। তিনি হরিভক্ত হন। কৃষিকাজে দারুণ নিপুণ ছিলেন। এই গোলক গোস্বামীর গলায় অসুখ করে। কোন

খাবারই তিনি খেতে পারছিলেন না। এই সময় বাউৎখামার গ্রামের ভক্ত রামচাঁদ হরিচাঁদ রামচাঁদ ঠাকুরের নামে রোগারোগ্য করতেন। সেই ভক্ত রামচাঁদকে আনবার জন্য রাউৎখামার যাচ্ছিলেন রামকুমার গোলকের অগ্রজ ভাই। এই সময় বালাবাড়ির গিরিধর বালা ছিল জ্বরে অচেতন তাদের বাড়ি থেকেও রামচাঁদকে আনবার জন্য যায়। গিরিধরকে চিকিৎসা করার জন্য ভক্ত রামচাঁদ আসেন ও গিরিধরকে সুস্থ করার পর রামকুমারের গলা ঝাড়েন। এবং বলেন তুমি বাড়িতে গিয়ে দেখ গোলকের গলা 'ফুলা নাই'। এবং রামকুমার সেই ঘটনাই দেখেন বাড়িতে গিয়ে গোলক সুস্থ হয়েছে। একথা গোলক গোস্বামীকে বলার পর গোলক গোস্বামী হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যান। সেখানে তিনি তার প্রাণের ঠাকুরকে দেখতে পানও নিজেই ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থের 'গোস্বামী গোলকচাঁদের আখ্যান' থেকে গোলক চাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে জানা যায়—

.....

''সাহাপুর পরগণা তাহার অধীনে।
নারিকেল বাড়ী গ্রামে জানে সর্ব্বজনে।।
এই বংশে যতজন সবে মহোদয়।
বংশ অনুরাগ হরিভক্তি অতিশয়।।

.....

.....

গোলক উন্মত্ত চিত্ত ঠাকুর ভাবিয়া।
উপাধি হইল শেষে 'পাগল' বলিয়া।।
কৃষিকার্য্য করিতেন গোস্বামী গোলক।
ধান্যক্ষেত্র কার্য্যে ছিল বড়ই পারক।।

.....

উঁচু নিচু না রাখিত জমির মাঝেতে।
সমতল ধান্যক্ষেত্র করিত স্বহস্তে।।
যে জমির ধান্য কাটে আঠার কিষাণে।
তাই তিনি কাটিতেন একা একদিনে।।

.....

কণ্ঠ দেশ ফুলিয়া ক্রমশ হল ভারী।

শয্যাগত রহিলেন হয়ে অনাহারী।।

নাসারন্ধ্রে ঘনশ্বাস বাক্য নাহি সরে।

দুগ্ধ পান আদি বন্ধ হল একেবারে।।

রাউৎখামার রামচাঁদ মহাশয়।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ ঠাকুরের কাছে আসে যায়।।

রোগ যুক্ত রোগী যত রামচাঁদে ধরে।

ঠাকুরের নামেতে রাখিয়া রোগ সারে।।''[৩৭]

রামচাঁদ মহাশয় অচেতন জ্বরের রোগী গিরিধরকে সুস্থ করেন। নারকেলবাড়ি যাননি তিনি। গোলক গোস্বামীর ভাই রামকুমারের গলা ঝাড়লেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে। তার চিকিৎসায় গোলক গোস্বামীর গলা ফুলা সারলেন। গোলক গোস্বামী ভাইয়ের কাছে আদ্য প্রান্ত বিবরণ শুনে ঠাকুরের ভক্ত হন ও ঠাকুর দর্শনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। গোলক গোস্বামী আজীবন ঠাকুরবাড়িতেই অবস্থান করছিলেন ও ঠাকুরের ভক্তদের সুখ দুঃখের সাথী হয়েই জীবন অতিবাহিত করেছেন। গোলক গোস্বামী মহা অনুরাগী হয়ে অনেক অনেক কাজ করেন সমাজের মানুষের। 'হরিনাম' দিতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞায়ও রোগারোগ্য করতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে। এবং আজীবন হরিচাঁদ ঠাকুরের নিত্য সহচর ছিলেন। আর একটি কথা গোলক গোস্বামীর দেহত্যাগের পর তারকচন্দ্র সরকার পুত্র কাজ করেছিলেন। মহোৎসব করেছিলেন গোলক চাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায়। এই গ্রন্থ লেখককে গোলক বলেছিলেন, 'তুমি যদি পুত্র মোর হইতে তারক।' কবিরসরাজ তারকচাঁদ সরকারও যথাসাধ্য পুত্র কার্য করেছিলেন। তারকচন্দ্র সরকারকে গ্রন্থ রচনার জন্য বরদান করেন। তাই হরিভক্তগণ এক একজন মহাভক্ত ও সমাজ মানুষকে সুস্থ সুন্দর মনুষ্যত্ববোধের বিকাশের জন্য সর্বদাই কর্মে নিযুক্ত থেকেছেন। কবির বর্ণনায়—

.....

''রামচাঁদ ঠাই রামকুমার বলিছে।

মোর ভাই গোলক সে আছে কিনা আছে।।

বড়দায় ঠেকে আসিয়াছি দৌড়াদৌড়ি।

দয়া করে যেতে হবে নারিকেল বাড়ি।।

.....

বাবা হরিচাঁদ বলে ছাড়ে এক ডাক।

.....

হুঙ্কারিয়ে দুই হাতে গিরিধরে ঝাড়ে।

.....

মুহূর্তেক মধ্যে ব্যাধি আরোগ্য হইল।

রোগমুক্ত গিরিধর উঠিয়া বসিল।।

.....

ঝাড়িতে লাগিল রামকুমারের গলা।

বাবা হরিচাঁদ বলে ঘন ডাক ছাড়ে।

রাম কুমারের গলা রামচাঁদ ঝাড়ে।।

'দোহাই ওড়াকান্দীর বাবা হরিচাঁদ'।

গলা ঝাড়ে ডাক ছাড়ে যেন সিংহনাদ।।

দণ্ডমাত্র রামকুমারের গলা ঝাড়ি।

বলে আমি যাইব না নারিকেলবাড়ী।।

তোমরা গৃহেতে যাও আমি গৃহে যাই।

দেখ গিয়া গোলকের গলা ফুলা নাই।।

.....

এইসব প্রকাশিল বাটীতে আসিয়া।

গোলক উন্মত্ত হল সেকথা শুনিয়া।।

প্রভুকে দেখিব বলে ওড়াকান্দী যায়।

লোটাইয়া পড়ে গিয়া ঠাকুরের পায়।''[৩৮]

গোলক গোস্বামীকে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজের করেই গ্রহণ করেন। আর যেন চিরপরিচিত মানুষের জন্য ঠাকুর অপেক্ষা করে আছেন এহেন প্রকারে গোলকের সাথে মিলিত হন। গোলক

গোস্বামীও আরাধ্য ধন পেয়ে তাঁর কাছে চির বিক্রিত হলেন এবং নিজ আশ্রয় খুঁজে পান। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গোলকের কথোপকথনের মাধ্যমে সেই চির পরিচিতির সঙ্গে যেন মহামিলন হল সেই কথাই ব্যক্ত করেছেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে—

''প্রভু বলে এতদিন কেন নাহি এলি।
ব্যাধি যুক্ত হয়ে কেন এত কষ্ট পেলি।।
এতদিন পরে যদি এলি মম ঠাঁই।
যাও বাপ গৃহে যাও আর ভয় নাই।।
শুনিয়া গোলক প্রেমে কম্পিত হইল।
অনিমেষ নেত্রে রূপ দেখিতে লাগিল।।
.....
.....
বলে ''আমি আর না করিব গৃহবাস।
গোলক বলেন আমি কার বাড়ি যাব।
চরণে নফর হয়ে পড়িয়া রহিব।।''
প্রভু বলে ''ঘরে যাও ওরে বাছাধন।
চিরদিন মোর বলে থাকে যেন মন।।''
গোলক বলেন হরি চিনেছি তোমায়।
চিরদাস বিক্রিত হইনু তব পায়।।
প্রভু বলে ''বিকাইলি পাইলাম তোরে।
কর গিয়া কৃষি কার্য্য যাব তোর ঘরে।''
গোলক চলিল ঘরে প্রভুর কথায়।
সময় সময় ওড়াকান্দী আসে যায়।।
মাসান্তর পক্ষান্তর সপ্তাহ অন্তরে।
মাঝে মাঝে যাইত প্রভুকে দেখিবারে।।
দশরথ মহানন্দ মাতিল তাহাতে।
গ্রাম্য লোক প্রমত্ত হইল সেই মতে।।

হরিচাঁদ গোলকের ভাব প্রেম রসে।

আসা-যায়া করে প্রভু গোলকের বাসে।''[৩৯]

গোলক গোস্বামীর ভক্তি ভাবের জন্য ভক্ত মানুষেরা গোলক পাগল নামে জানতেন। গোলক পাগল বা গোলক গোস্বামী একজন মানুষের নাম। গোলক পাগল ছিলেন আত্মজ্ঞানী ভক্ত। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরকে হরিচাঁদ ঠাকুর গৃহভার অর্পণ করেন। তখন এই গোলক পাগল গুরুচাঁদ ঠাকুরকে পরীক্ষা করেছিলেন যে ঠাকুরের ভাবাদর্শময় ভক্তদের নিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের যে মহাগৃহ সেই মহাগৃহভার বহনের ক্ষমতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের আছে কিনা। বালক গুরুচাঁদ ঠাকুর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। পরে পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর সেই পরীক্ষার কথা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বলেন ও আত্মজ্ঞানের শিক্ষাদান করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের দেহাবসানের পর গুরুচাঁদ ঠাকুরই সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের মহাগৃহ ভার পালন করেন। গোলক পাগল ছিল এহেন আত্মজ্ঞানী ভক্ত। আচার্য মহানন্দ হালদার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ' চরিত' গ্রন্থে 'সংযম শিক্ষা লাভ' অধ্যায়ে গোলক পাগলের পরীক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন।

''শ্রীহরির ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাম শ্রীগোলক।

ব্যাধি হতে মুক্তি পেয়ে সাজিল সেবক।।

.....

.....

''শোন গুরুচাঁদ তুমি চেন না গোলকে।

তোমাকে দিয়াছি আমি সংসারের ভার।

গোলক করেছে মনে গূঢ় অর্থ তার।।

তুমি বুঝিয়াছ মনে এই ঘর বাড়ী।

গোলক বুঝেছে সে তো বাহির কাছারী।।

ধর্ম্ম খুঁটি দিয়া বান্ধি সেই ধর্ম্ম ঘর।

গোলক বুঝেছে পেলে সেই গৃহভার।।

এহেন দায়িত্বপূর্ণ সেই মহাভার।

পার কিনা নিতে করে পরীক্ষা তাহার।।

এ ভার বহিতে লাগে অসীম সংযম।

সংযমেতে প্রাপ্ত হয় ধৈয্য পরাক্রম।।

সামান্য দুঃখের কাজ জানিবে অস্থায়ী।

মহাদুঃখ সহ্য কর সাজিতে বিজয়ী।।

একেলা গোলক তোমা করিল বিরক্ত।

লক্ষ প্রাণী ভার নিতে তুমি তো অশক্ত।।

তব ধৈর্য্য পরীক্ষিতে গোলকের মন।

তার কাছে হেরে গেলে এ হল কেমন?

গোলক অলস কিসে মহাবীর্য্যবান।

দেখ গিয়া কাটিয়াছে সেই সব ধান।।

ধৈর্য্য শক্তি না থাকিলে সকলি বিফল।

ধৈর্য্য ধর কর্ম্ম কর প্রাণে হবে বল।।

আর শোন গুরুচাঁদ আমার বচন।

আমি যবে না রহিব কি হবে তখন।।

সংখ্যাতীত নরনারী সকলি আসিবে।

নানাভাবে সবে মিলি বিরক্ত করিবে।।

সকলি সহিতে হবে ধৈর্য্য শক্তি দিয়ে।

সে সব এখনে শেখ এক মন হয়ে।।

আর শোন জ্ঞানী লোক সেই কথা কয়।

'যে সয় সে মহাশয়' কথা মিথ্যা নয়।।''[৪০]

এ হেন আত্মজ্ঞান লাভের পর গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন সদয় হয় এবং গোলক গোস্বামীর কাছে যান গুরুচাঁদ ঠাকুর। মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

''প্রভুকে দেখিয়া সাধু হাসিয়া বলিল।

আমাকে ডাকিতে বাবা তোমাকে পাঠাল।।

গুরুচাঁদ বলে 'দাদা সকলি তো জান।

উঠে এস বাড়ী পরে আর জলে কেন।।'

এইভাবে গুরুচাঁদ সংযম শিখিল।

গোলকের প্রতি মন নির্ম্মল হইল।''[৪১]

এ হেন কর্মী জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন গোলক পাগল। তার অগণিত কার্য কলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। যার দ্বারা সমাজের মানুষের বহু উপকার সাধিত হয়েছিল। গোলক পাগলের প্রিয়পুত্র সম এক ভক্ত হল কার্ত্তিক ও অম্বিকা। এই কার্ত্তিকের পুত্র হল গুরুচাঁদ ঠাকুর কথিত মহারত্ন অশ্বিনী গোঁসাই। যিনি একনিষ্ঠ ভক্ত ও 'শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন' গ্রন্থের রচয়িতা।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোস্বামী হীরামন অন্যতম। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস হরিভক্ত হওয়ার পর মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও দেবী কাশীশ্বরী হরিচাঁদ ঠাকুরকে একদিন পদ্মফুল দিয়ে সাজান তাদের বাড়িতে। সেই দিন হীরামন গোস্বামী হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখতে যান মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়িতে। হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে হীরামন গোস্বামী মূর্ছাযান ও মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস অচেতন হীরামনকে 'হরিনাম' কর্ণে শোনানোর পর জ্ঞান ফিরলেও সেই থেকেই হরি প্রেমে মত্ত হন। কৃষিকর্মে অত্যন্ত পারক থাকা সত্ত্বেও হরিচাঁদ ঠাকুর দর্শনে আত্মহারা হয়ে হরিনামে রত হন। হীরামন গোস্বামী নিজেই হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে হরিনামে প্রেমে মত্ত হন। পরে হীরামন গোস্বামীর অসুখ হলে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে ফেলে আসেন তার বাড়ির লোকেরা। ফেলে আসা মৃতপ্রায় হীরামনকে সুস্থ করে নিজের করে নেন হরিচাঁদ ঠাকুর। পরবর্তীকালে এই হীরামন গোস্বামী পাগল আখ্যায় ভূষিত হন ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শকেই বহন করেছেন সারা জীবন। তিনি সংসারী থাকলেও পরে সংসার থেকে চলে আসেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছেও ভক্ত মানুষের মাঝে। হীরামন গোস্বামীকে যে কথা বলেন ঠাকুর তা বহিরঙ্গ ভক্ত মানুষের কাছে ব্যক্ত করতে নেই। একথা বলেছেন ভক্ত হীরামনকে। কেননা ভগবানে বিশ্বাস হল যার যার হৃদয়ানুভূতির অভিব্যক্তির প্রকাশ। তাই একেই সকলের হৃদয় তৃপ্ত হয় না। আবার কেউ কোন অসম্ভব কিছু কারো মাঝে দর্শন করলেও তাকে গোপনে রাখাই নিয়ম। লোকসমাজে ব্যক্ত করতে নেই। 'হীরামন পাগলের উপাখ্যান' থেকে জানা যায়—

''মৃত্যুঞ্জয় হরি বোলা হল ভাগ্যক্রমে।
যাতায়াত করে প্রভু মল্লকাঁদি গ্রামে।।
মৃত্যুঞ্জয় ভবনে আসেন হরিচাঁদ।
সস্ত্রীক সেবেন হরিচাঁদের শ্রীপদ।।

.....

.....

রাউৎখামার বাসী হীরামন নামে।

প্রভু প্রিয় ভক্ত বড় অপার মহিমে।।

কৃষকেরা কৃষিকার্য্য করিবারে যায়।

সেই সঙ্গে ধান্য জমি আবাদ ইচ্ছায়।।

.....

পাঁচ সাতজন কিম্বা দশ বারো জন।

দলে দলে সারি সারি চলে সর্ব্বজন।।

.....

হীরামন সেই সঙ্গে চলে গাতা ধরে।।

মৃত্যুঞ্জয় ফুল সাজে সাজায়ে ঠাকুরে।

বসায়েছে উত্তর গৃহের পীড়ি পরে।।

.....

এমন সময় হীরামন ফিরে চায়।

ঠাকুরের ঐ সজ্জা দেখিবারে পায়।।

সকল কৃষককে ডেকে বলে হীরামন।

চল সবে করি গিয়া ঠাকুর দর্শন।।

নহে তোরা অগ্রেতে যা, পরে আমি যাব।

নহে তোরা সবে চল ঠাকুর দেখিব।।

এত বলি অগ্রে চলে বালা হীরামন।

বাটীর উপরে গিয়া উঠিল তখন।।

ঠাকুরের মনোহর ফুল সাজ দেখি।

এক দৃষ্টে চেয়ে রহে ঠাকুর নিরখি।।''[৪২]

হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে হীরামন গোস্বামী তার আপন কল্পনার ভগবানকে দেখতে পান হরিচাঁদ ঠাকুরের মধ্যে। ফলে আত্মজ্ঞান হারা হয়ে পড়েন ভক্ত হীরামন।

.....

‘‘হীরামন স্কন্ধে ছিল বাঁশ এক খণ্ড।

থোড়া বাঁশ ধান্য তৃণ আকষণী দণ্ড।।

স্পন্দহীন বাক্য রোধ ভুজে নাহি বল।

পড়ে গেল থোড়া বাঁশ চক্ষে বহে জল।।

লোমকূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটন আকার।

স্বেদ বহে শরীরে চমকে বার বার।।

অবশ হইল অঙ্গ পড়িল ধরায়।

প্রভু বলে ওরে ধর ধর মৃত্যুঞ্জয়।।

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত হয়ে ধরে তার হাতে।

বসাইল আনিয়া প্রভুর সন্মুখেতে।।

দ্বিমুহূর্ত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত ছিল হীরামন।

.....

প্রহরেক জড় প্রায় রহিল বসিয়া।

থেকে থেকে মাঝে মাঝে ওঠে শিহরিয়া।।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমে হয়ে এল বন্ধ।

মুখে না নিঃশ্বরে বাণী কণ্ঠ হল রুদ্ধ।।

এমন সময় মহা প্রভু ডেকে কয়।

ফিরে পল হীরে ওরে ধর মৃত্যুঞ্জয়।।

মৃত্যুঞ্জয় গিয়া হীরামনে স্পর্শ করে।

অস্থিরতা ঘুচে সাধু শান্ত হৈল পরে।

মৃত্যুঞ্জয় কর্ণেতে শুনায় হরিনাম।’’[৪৩]

এভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে আত্মহারা হয়ে ভক্তিতে বাধ্য হন হীরামন গোস্বামী। তাঁর প্রতি হরিচাঁদ ঠাকুরের যে কথাগুলি পাওয়া যায় তাতে ভগবানের ও ভক্তের আত্মদর্শন তথা গভীর কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

.....

''প্রভু কহে কহি তোরে ওরে হীরামন।

যদি কেহ কারু কিছু করে দরশন।।

অসম্ভব দেখে জ্ঞানী প্রকাশ না করে।

শুনিলে সন্দেহ হয় লোকের অন্তরে।।

শৈল মাঝে অগ্নি থাকে জানে সর্ব্বলোক।

ঠুক্কি লৌহা ঘাতে জ্বলে উঠে সে পাবক।।

তেমনি পাথর মাঝে রহিয়াছে অগ্নি।

দেখিতে পাইবা পুনঃযদি থাকে ঠুক্কি।।

কিন্তু সে আগুন যদি জ্বালাইয়া লয়।

শীলাকাষ্ঠ পুড়ে যায় কিছু নাহি রয়।।

তুমি আছ আমি আছি তাতে কিবা ভয়।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে যাও নিজালয়।''[৪৪]

হীরামন গোস্বামী হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখে তার অন্তরাত্মায় যে ভক্তি নিহিত ছিল তার প্রকাশ ঘটে। ফলে তার নিজের কাজ যে কৃষি কাজ তাও ছেড়ে দিয়ে হরিনাম করে। বাড়িতে গিয়ে এহেন আচরণের ফলে তার খুড়া বিদ্বেষ করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি হীরামন গোস্বামী অসুস্থ হলে তাঁকে ওড়াকাঁন্দি ফেলে আসেন। আবার হীরামন গোস্বামী ওড়াকাঁন্দি থেকে সুস্থ হয়ে বাড়িতে আসেন সংসার ধর্ম পালনের জন্য। কিন্তু হরিনামে মত্ত থাকেন সংসার কর্মের মাঝেও হীরামন গোস্বামী সাধনার জন্য রাত্রে গৃহত্যাগ করে নির্জন স্থানে বসে হরিনাম করতে যেতেন । তাতে তার নারী অভিযোগ করেন যে ভক্ত হীরামনকে ভূতে পেয়েছে। ভূত তাড়ানোর জন্য হরিভক্ত হীরামনকে অকথ্য অত্যাচার করেন। ভক্ত হীরামন হরিনাম যান যায় শেষে আর অত্যাচার সহ্য করতে পারেন না, তখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে প্রতিবাদ করে ওড়াকাঁন্দি হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে চলে যান। আর সেই থেকেই হীরামন গোস্বামী সংসারের মায়া ত্যাগ করে হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আবার কখনও ভক্তালয়ে ভ্রমণ করতেন। এই হীরামন গোস্বামীর কথা বিস্তারিত বলতে গেলে একটি বড় অধ্যায় হয়ে যাবে। তাই যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করেই ব্যক্ত করার চেষ্টা করলাম— তবুও তৎকালীন সমাজে হীরামন গোস্বামী কত মানুষকে রোগারোগ্য করেছেন তার ইয়ত্তা

নেই। হরিচাঁদ ঠাকুরের নাম গান করেছেন এবং মানুষকে হরিনামে মত্ত করেছেন এমন মানুষের সংখ্যাতীত বর্ণনা পাওয়া যায়। হীরামন গোস্বামীর অত্যাচার প্রসঙ্গ ও রোগারোগ্যকে তারকচন্দ্র সরকার এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''আমরা জানি তিনি স্বয়ং স্বরূপ।।
সব হরিবোলা করে সংসারের কার্য্য।
.....
হীরামন কার্য্য ত্যাগী দেখিয়া বিশেষ।
ঠাকুরের প্রতি কারু জন্মিল বিদ্বেষ।।
শ্রীচৈতন্যবালা হীরামনের সে খুড়া।
ঠাকুরের প্রতি দ্বেষ করে সেই বুড়া।।
.....
মতুয়া হইল এরা কি ধন পাইয়া।
বেদবিধি না মানে ফিরেছে লাফাইয়া।।
.....
আত্মস্বার্থ সমর্পণ বাবা হরিচাঁদে।
হরি বলে দিন রাতি করে সোরা সোরি।
বাবা যদি হরিচাঁদ যাক সেই বাড়ী।।
.....
হরিচাঁদ মৃত্যুঞ্জয় দোহে নাকি ব্রহ্ম।
এমরা বাচাতে পারে তবে জানি মর্ম্ম।।
.....
ডুবু তরী যদি হরিচাঁদ করে রক্ষা।
কেমন ঠাকুর তবে বুঝিব পরীক্ষা।।
.....
হীরামনে লয়ে গেল ওড়াকাঁদি বাড়ি।
হীরা মনে তুলে এক গাছ তলা রাখে।।

.....

প্রভু হরিচাঁদ তবে কহেন অগ্রজে।

.....

একরাত্রে নিজ্জনেতে বলে হরি হরি।

এ রোগী চিকিৎসা আমি করি বারে পারি।।

.....

সেই গ্রামে হরিবোলা মতুয়ারা দল।

ভকত বাচাও ভাই ভকত বৎসল।।

.....

প্রভু বলে যাহা হোক সবে যাহ ঘরে।

আমি দেখি চেষ্টা করে ঈশ্বর কি করে।।

সবে গেল প্রভু মাত্র রহিল একেলা।

মরা হীরামনে লয়ে সেই গাছতলা।।''[৪৫]

অসুস্থ মৃতপ্রায় হীরা মন সুস্থ হলে হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে নির্দেশ দেন মায়াতীত হয়ে হরি গুণ গান করার। হরিচাঁদ ঠাকুর হীরামন গোস্বামীকে শিক্ষা দেন সংসারে নারীর প্রতি কর্তব্য রয়েছে। তার প্রতি নির্দেশ দেন সংসার ধর্ম পালনের।

''যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ।

নিরোগ শরীর হল পূর্ণ শক্তি মান।।

উঠিয়া চরণ ধরি বলে ওহে নাথ।

এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ।।

যে দিন তোমার দেখা পাই মল্লকাঁদি।

পিঞ্জিরা রাউৎখামার পাখি ওড়াকাঁদি।।

ঠাকুর বলেন আমি জানি তা সকল।

সে কথায় কাজ নাই হরি হরি বল।।

এমত আমার কর্ম্ম রোগ ভোগ দিয়ে।

সংসার হইতে তোরে নিলাম উঠায়ে।

তোর প্রতি আর কারু থাকিল না দাবি।।

মায়াতীত হলি এবে হরিগুণ গাবি।।

.....

সংসারের মাঝে তুই কারু দায়ী নাই।

একমাত্র দায়ী রৈলী রমণীর ঠাই।।

যাও বাছা দিন কত করগে সংসার।

শোধ দিয়া এস গিয়া রমণীর ধার।।

জন্মিলে একটি পুত্র তাহার গর্ভেতে।

রমণীর ধার তবে পার শোধ হতে।।''[৪৬]

হীরামন গোস্বামীকে ভূতে পেয়েছে এই ভ্রান্ত ধারণায় ভূত তাড়ানোর ছলে হীরামন গোস্বামীকে অকথ্য অত্যাচার করেন তার পরিবার। তার বিবরণ পাওয়া যায় 'গোস্বামী হীরামনের প্রতি কালাচাঁদ ফকিরের অত্যাচার বিবরণ' অংশে। কালাচাঁদ ফকির রোগারোগ্য করার জন্য ভক্ত হীরামনকে শাস্তি দেন। একথা বলাই বাহুল্য যে যার হয়েছে হরি প্রেমোন্মাদ তাকে ফকিরকি রোগারোগ্য করতে পারবেন। বরং অত্যাচার করলে হরিভক্তি আর গভীরতা পায়। একথাই ব্যক্ত হয়েছে ভক্ত হীরামনের জীবনে। কবির বর্ণনায়—

.....

''রুলাখাতে করিবরে পাগলাই দূর।

দেখিব কেমন তুই পাইলি ঠাকুর।।

.....

দৃকপাত তাতে নাহি করে হীরামন।

ঝুকে ঝুকে করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।

.....

ফকির বলেছে বাছা কহ শুনি কথা।

হেট মুণ্ডে রহে সাধু নাহি তুলে মাথা।।

মাথা নাহি তুলে সাধু শ্বাস ছাড়ে দীর্ঘ।

সবে বলে কই হল রোগের আরোগ্য।।

.....

পুন পৃষ্ঠ মোড়া দিয়া দুবাহু বাঁধিল।

হস্তদ্বয় বাঁধি তার একত্র করিল।।

সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া তার বাঁধিল যে কর।

দুই দুই অঙ্গুলী করিয়া একতর।।

ওঝা বলে ছেড়ে যাবি কিনা যাবি বোঝ।

এত বলি অঙ্গুলির মধ্যে মারে গোজ।।

খর্জ্জুর কন্টক তবে চারিটি আনিয়া।

নখতলে মাংস মধ্যে দিল বিধাইয়া।।

ভাল রজ্জু দিয়া দিল পিঠ মোড়া বাঁধা।

নাহি তাতে হাহা হুঁহু নাহি তাতে কাঁদা।।

.....

.....

পুনর্ব্বার বেকি অস্ত্র আগুনে পোড়ায়।

পোড়া যা উপরে যবে ধরিবারে যায়।।

এমন সময় উঠি হুঙ্কার করিয়া।

গাত্র মোড়া দিয়া দড়া ফেলিল ছিঁড়িয়া।।

হাতঝাড়া দিলে কাঁটা খসিয়া পড়িল।

আঙ্গুল বন্ধন হাত মোড়ায়ে ছিড়িল।।

.....

বেকি অস্ত্র কাড়িয়া লইল অতি কোপে।

আরক্ত লোচন ক্রোধে হীরামন কাঁপে।

বিনয় চৈতন্য বলে শুন ওরে বাপ।

অপরাধী তোর ঠাই করিয়াছি পাপ।”[৪৭]

এই অসহ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষে ক্রোধ প্রকাশ করেন ও সকলকে ত্যাগ করে হীরামন গোস্বামী শ্রীধাম ওড়াকাঁদি ঠাকুরের কাছে চলে যান। গিয়ে দেখল আঘাতের

চিহ্নগুলি সকলই ঠাকুরের গায়। আর হরিচাঁদ ঠাকুর হীরামনকে নিজ হাতে তার সেবা করেন ও তাকে নিজের করে নেন। এভাবে পুনরায় হীরামন গোস্বামী ও হরিচাঁদ ঠাকুরের মহামিলন হল।

.....

''ঝুকে ঝুকে করে হরিনাম উচ্চারণ।।

.....

উপনীত ওড়াকাঁদি প্রভুর শ্রীধাম।।

বীররসে রাগাত্মিকা ভাবের উদয়।

দেখি প্রভু হীরামনে ক্রোড়েতে বসায়।।

হীরমনে পুকুরের ঘাটে লয়ে পরে।

শ্রীকরেতে শ্রীনাথ শ্রীঅঙ্গ ধৌত করে।।

কর্দ্দম শৈবাল অঙ্গে লেগে রহিয়াছে।

কমল কন্টক অঙ্গ ক্ষত করিয়াছে।।

ধৌত করি হস্ত ধরি গৃহেতে লইল।

কর্পূর মিশ্রিত তৈল অঙ্গে মাখাইল।।

.....

মারিতে দিলে না প্রভু তুমি কৈলে মানা।

মারিতে আমার মনে হল বড় ঘৃণা।।

সকল তোমার খেলা কি খেলা খেলাও।

করিয়া করাও রঙ্গ মারিয়া মারাও।

মহাপ্রভু বলে আর কহিতে হবে না।

জানি সব তবু ইচ্ছা তোর মুখে শুনা।।''[৪৮]

ভক্তিতে বাধ্য হয়ে হরিচাঁদ ঠাকুর হীরামনকে বললেন—

''মম প্রাণাধিক তুই উত্তম পুরুষ।

পরাধীন নহ বাছা খাসের মানুষ।।

যথা তথা আছ বাছা তথা আমি আছি।

তোর কাছে আমি বাছা বিক্রিত হয়েছি।।''[৪৯]

এভাবে হীরামন ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন। এবং এই হরিচাঁদ ঠাকুর অন্ত প্রাণ পুরুষগণ তৎকালীন সমাজে যে কাজগুলি করেছেন মানুষের জন্য আজও মানুষেরা পুরুষানুক্রমে ব্যক্ত করে থাকেন। এভাবে একা হরিচাঁদ ঠাকুর আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণের দেহে বহু হয়ে সমাজে 'হরিনাম' প্রচারও মানুষের কল্যাণ কর্ম করেন।

লোচন গোস্বামীর কথা বললে প্রথমেই বলতে হয় যে হরিচাঁদ ঠাকুরের থেকে বড় ছিলেন লোচন গোস্বামী। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরকে খুব মধুর ভাষায় সম্বোধন করতেন। এই সঙ্গে তারকচন্দ্র সরকারের কথাও বলে নেওয়া যায়। একদিন ওড়াকাঁন্দির ঠাকুর বাড়িতে তারকচন্দ্র সরকার আছেন সেই সময় লোচন গোস্বামী ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা শুনে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত তারকের মনে বড় সাধ হয় যে লোচন গোস্বামীর সেবা করার। লোচন গোস্বামীর হরিচাঁদ ঠাকুরকে ডাকছেন সেই ডাক ও হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভোজনের প্রসঙ্গটি কবিরসরাজ তারক সরকার বড় ভাল লেগে যায়। লোচন গোস্বামী তখন ভক্ত তারককে ডেকে তার পরিচয় নেন ও বলেন আমি জয়পুর গ্রামে যাই। তার অর্থ এই যে আমি তোমার বাড়িতে যাব। সেই কথা পরবর্তীকালে লোচন গোস্বামী রেখেছিল কবি তারকচন্দ্র সরকারের কাছে সাত বছর ছিলেন। লোচন গোস্বামীর কথাকে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''ওঢ়াকাঁদি শ্রীধামে তারক গিয়াছিল।
সেদিনে গোস্বামী ধামে উপস্থিত হল।।
ও হরি! ও হরি! বলে গোস্বামীজী ডাকে।
মহাপ্রভু ডাক শুনে পরম পুলকে।।
.....
দুই চারি পদ হাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
মহাপ্রভু সঙ্গে রঙ্গে কথা কন গিয়া।।
ডেকে বলে ওহে হরি তুমি ত গোঁসাই।
আসিলে তোমার বাড়ী বড় ভাল খাই।।
সেই জন্য আসি আমি সময় সময়।

তোমার বাটীতে বড় ভাল পাক হয়।

.....

হরিচাঁদ প্রভু কন থাক এ বেলায়।

কৃষ্ণের নৈবেদ্য যেন তোমা হতে হয়।।

থাকিল লোচন হল ভোজন সময়।

চারিদণ্ড রাত্রিকালে বসিল সেবায়।।

ঠাকুরে বলেন হরি! তুমিও বসহ।

আমি এই বসিলাম মাতাকে বলহ।।

দুই ঘরে দুই প্রভু বসিল সেবায়।

উত্তরের ঘরে হরিচাঁদ দয়াময়।।

.....

ভোজন করেছে আর বলেছে লোচন।

বড়ই সুপক্ক স্বাদু সুক্তার ব্যঞ্জন।।

হেন ব্যঞ্জনাদি আমি কোথাও না পাই।

তোমার মন্দিরেতে উদর পুরে খাই।।

শান্তি মাতা ব্যঞ্জন দিলেন দুইবার।

তাহা শুনি ব্যঞ্জন দিলেন আরবার।।

আর বার বলে হরি খাইলাম ভাল।

কিবা সুব্যঞ্জন মম রসনা রসিল।।

.....

গৃহস্থ হয়েছে ভাল হইয়াছে ভাল।

মাতা ভাল পাক ভাল খাই আমি ভাল।।

.....

এই রূপে ব্যঞ্জন লইল পাঁচ বার।

প্রভু হরিচাঁদ বলে না লইও আর।।

তাহা শুনি লোচন ভোজন করে ক্ষান্ত।

হীন নিদ্রা জেগে থেকে নিশি করে অন্ত।''[৫০]

লোচন গোস্বামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ হীরামন গোস্বামীকে বাকসংযম শিক্ষা দিয়ে তার চরিত্রকে আরও দৃঢ় নিষ্ঠা দান করেন। লোচন গোস্বামী ভিক্ষা করতেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে রয়ঃজেষ্ঠ ভক্ত মানুষ ছিলেন। তিনি যেমন করে হরিচাঁদ ঠাকুরকে নাম ধরে ডাকতেন তেমন আর কারো সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনিও বহু জায়গায় গিয়ে হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা ব্যক্ত করতেন। ও হরিচাঁদ ভক্তগণকে যথাসাধ্য উপকার করতেন নানাভাবে।

এই লোচন গোস্বামী জয়পুর গ্রামে তারকচন্দ্র সরকারের কাছে দীর্ঘ সাত বছর অতিবাহিত করেছেন। তারকচন্দ্র সরকার লোচন গোস্বামীকে ওড়াকাঁন্দি দেখেছিলেন। সেসময় তারকচন্দ্র সরকারের মনে হয় কতদিনে গোস্বামীর সঙ্গ পাবেন। একদিন তারকের ঘাটে নৌকা রাখেন লোচন গোস্বামী। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকারের কাছে সাত বছর থেকে যান ভক্তিতে বাধ্য হয়ে—

''সে হইতে তারকের বাঞ্ছা ছিল মনে।
হেন গোস্বামীর সঙ্গ পাব কতদিনে।।
হেন প্রভু তারকের ঘাটেতে উদয়।
গলে বস্ত্র কর জোড়ে তারক দাঁড়ায়।।
তারক কহিছে প্রভু আমি সে কারক।
আপনার দরশনে শরীর পুলক।।
ঘাটে নৌকা লাগাইল তারক তখনে।
আনন্দে গোস্বামী লয়ে চলিল ভবনে।।
সে হইতে গোঁসাই রহিল সপ্তবর্ষ।
পূর্ণানন্দ সদা সবে নাহিক বিমর্ষ।।
সময় সময় যাইতেন অন্য স্থানে।
বেশী হলে থাকিতেন দুই তিন দিনে।।
তারকের হত যবে একান্ত মনন।
মন বুঝে এসে দেখা দিতেন তখন।।''[৫১]

এভাবে লোচন গোস্বামীকে কাছে পাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। আর তারকচন্দ্র সরকার ছিল সর্ব কনিষ্ঠ ভক্তদের অন্যতম তার ফলে তারকচন্দ্র সরকার ছিল সকলের প্রিয়। তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন সাধক ও সুগায়ক।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত গোলক কীর্ত্তনীয়া কীভাবে ওড়াকাঁন্দি ঠাকুরের ভক্ত হন সেই কাহিনিটি আলোচনা করব। গোলক কীর্ত্তনীয়া হল বিখ্যাত রামায়ণ গায়ক। তিনি সুগায়ক ও সুশাস্ত্র বক্তাও ছিলেন। রামায়ণ গান করে জগৎ মাতালেও তিনি ছিলেন আত্মগর্বি মানুষ। তিনি যখন বাতব্যাধিতে শয্যাগত তখন গ্রামের মানুষ পরামর্শ দেন যে হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভক্তি করলেই তিনি ভাল হতে পারেন। গোলক কীর্ত্তনীয়া নানা অবাক্য কুবাক্য বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে। পরে সকলের অনুরোধে তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে গেলেও তিনি বলেন তিনি যদি অন্তর্যামী স্বয়ং ভগবান হন তাহলে তার কথা বলে দেবেন এবং তখন তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। এভাবে হরিচাঁদ ঠাকুরকে নানা কটুক্তি করেন বাড়িতে বসে। পরে গোলক কীর্ত্তনীয়াকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক কীর্ত্তনীয়ার বাক্যাবলী আদ্যপ্রান্ত বলে দেন। গোলোক কীর্ত্তনীয়ার আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয় ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে নিজেই আত্মসমর্পণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তার ভক্তদের কাছে কত যে পরীক্ষা দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর অবশেষে পরীক্ষাকারীরা নিজেই পরীক্ষকের কাছে পরীক্ষা দিয়েছে ভক্তির দ্বারা। তারা সারা জীবন বংশানুক্রমে ঠাকুরের ভক্তে পরিণত হন। এভাবেই ওড়াকাঁন্দির হরিচাঁদ ঠাকুর সকলের প্রাণের ঠাকুরে পরিণত হন। গোলক কীর্ত্তনীয়া ও হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায় শারীরিক অসুখ থেকে মুক্ত হন যেমন তেমনি মানসিক ব্যাধিরূপ আত্ম অহংকার মুক্ত হতে পারেন ঠাকুরের কৃপা শক্তি প্রভাবে। হরিচাঁদ ঠাকুরও গোলক কীর্ত্তনীয়ার যে কথোপকথন সেখান থেকে ভক্ত ও ভগবানের এক গভীর হৃদয়স্পর্শী ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে কাব্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন—

"মল্লকাঁদি বাসী কীর্ত্তনীয়া রঘুনাথ।
তস্য জেষ্ঠ পুত্র নাম শ্রীগোলকনাথ।।
.....
রামায়ণ গান যদি হত কোন খানে।

বাল বৃদ্ধ যুব মত্ত হইত সে গানে।।

রাম রাম বলি যবে ধরিতেন তান।

স্মৃতি শূন্য হত কারু না থাকিত জ্ঞান।।

এইভাবে গান করে জগৎ মাতাল।

এবে শুন যে ভাবেতে হরিবোলা হল।।

বাত ব্যাধি হয়ে ক্রমে অঙ্গ পড়ে গেল।

ধরা শয্যা গত ক্রমে অচল হইল।।

সবে বলে হরি ঠাকুরের কাছে চল।

তাহার কৃপাতে কত রোগ মুক্ত হৈল।।

এদেশে আসেন তিনি রাউৎখামার।

এগ্রামেও এসে থাকে মৃত্যুঞ্জয় ঘর।।

সেই ঠাকুরকে ভক্তি কর মহাশয়।

মরা জীয়াইতে পারে যদি দয়া হয়।''[৫২]

গোলক কীর্ত্তনীয়া আত্মগর্বি ছিল তার পরিচয় পাই আমরা—

''গোলক বলেছে আমি ঠাকুর না মানি।

ওর মত ঠাকুর কত মোট বইতে আনি।।

.....

যত সব মুর্খ ভেড়ে ঠাকুর পেয়েছে।

ঠাকুরালী খাটে না এ গোলকের কাছে।।

শ্রীহরিচাঁদে গুণে বলিহারি যাই।

ছিল ক্ষুদ্র নমঃশূদ্র হয়েছে গোঁসাই

.....

গোলকে তরালে বলি গোলকের নাথ।

দুর্ব্বাক্য আমি যে কত বলেছি তাহারে।

.....

দেখি সে ঠাকুর কি করিতে পারে।।

কর্ম্ম ক্ষেত্রে ভবজীবে ভোগে কর্ম্মফের।

সারিতে না পারে যদি শেষে পাবি টের।।

যদি বলিবারে পারে হৃদয়ের কথা।

তবে তার শ্রীচরণে নামব এ মাথা।।''[৫৩]

গোলক কীর্ত্তনীয়া কেন সকল মানুষই কৌতুহলাক্রান্ত থাকেন। অবিশ্বাস, আত্ম অহংকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। আত্মদর্শনকারী মানুষের স্মরণাগত হলে তিনি মানুষকেও আত্মদর্শন করার মতো সুযোগ দেন। তবেই আত্মসম্বিত ফিরে পান আত্ম অহংকারী মানুষ। আর মহৎ মানুষ যে পরশমণি তা তাঁর সানিধ্য ছাড়া বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে গোলক কীর্ত্তনীয়াও হরিচাঁদ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভের আগে আত্ম অহংকারী থাকলেও পরে তিনি আত্মসমর্পণকারী মানুষে পরিণত হন। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই যারা হরিচাঁদ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আত্মপরিচয় বর্গের সুপরামর্শ শোনেন গোলক কীর্ত্তনীয়া। কবির বর্ণনায়—

.....

''আত্ম পরিজন আর প্রতিবাসী লোকে।

সবে মিলে বলে কয়ে বুঝায় গোলকে।।

এ সময় গৌরব তোমার ভাল নয়।

অহংকার ছাড় এই অন্তিম সময়।।

আত্ম শুদ্ধ করিয়া বলহ হরি হরি।

ঠাকুরের নাম হরি দেয় হরি নাম।

ইহকালে পরকালে পুরে মনষ্কাম।।

নহে দেব দেবী নহে কোন রূপ বার।

দেখিলে প্রত্যয় হবে স্বয়ং অবতার।।''[৫৪]

এরপর গোলকের মন পরিবর্তন হয় ও সকলে মিলে গোলক কীর্ত্তনীয়াকে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যান। গোলোক কীর্ত্তনীয়া ঠাকুর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল তা বলেন। পরে গোলকের সাথে ঠাকুরের ভাবালাপের থেকে বোঝা যায় ঠাকুর কতটা মানবতার পূজারী। ও কতটা মানুষকে নিজে ভালোবেসে ধরা দেন ও সকল রোগী, ভোগী দুঃখী মানুষকে। হরিচাঁদ ঠাকুর সকলকে গোলকের কথা বলেনও গোলকের অন্তরের কথাগুলিও ব্যক্ত করেন।

''ঠাকুর আছেন বসে উত্তরের ঘরে।

গোলকে রাখিল নিয়া পীড়ির উপরে।

.....

ঠাকুর বলেন আমি কিসের মানুষ।

বিদ্যা বুদ্ধি হীন আমি অতি কাপুরুষ।।

রঘু কীর্ত্তুনের বেটা গোলক কীর্ত্তুনে।

আমি কি মানুষ বাপু উহার ওজনে।।

.....

মোর মত লোক ওর নার দাড় বায়।

মোর মত লোক ওর মোট বয়ে খায়।।

.....

কোথা হতে আসিয়াছি ঠাকুর কিসের।

ব্যাধি যদি নাহি সারে শেষে পাব টের।''[৫৫]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা শোনার পর গোলকের আত্ম জাগরণ ঘটল। তখন সম্বিত ফিরে পেলেও নিজের মনের যে পতিতা বস্থা ঘটেছে আত্ম অহংকারে, সেই কথা নিজ মুখে ব্যক্ত করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। গোলক কীর্ত্তনীয়াকে হরণ করার কথা গোলক বলেছেন হরিচাঁদ ঠাকুরকে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান দান করে আত্মসাথে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর তাকে তার প্রার্থিত ভক্তি জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের করে নিয়ে তাকে আত্মশুদ্ধ করলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভক্ত গোলকের ভাবালাপে দেখা যায় ভক্ত গোলক হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করেনও ঠাকুর তাকে গ্রহণ করেন।

''.....

শুনিয়া বিস্মিত হৈল গোলকের মন।

উঠিতে পারে না বলে দেহ শ্রীচরণ।।

.....

সুখে মত্ত হইয়া হয়েছি চির দুঃখী।।

যারা মোরে আনিয়াছে তোমার নিকট।

তাহাদের সঙ্গে আমি করিয়াছি হট।।

সবে বলে তুমি নাকি স্বয়ং অবতার।

ত্যক্ত হয়ে তাদের করেছি কটূত্তর।।

.....

তুমি ত করুণানিধি আমি দুরাচার।।

পতিত পাবন নাম ধর দয়াময়।

এমন পতিত আর পাইবা কোথায়।।

কোন যুগে পেয়েছ কি এমন পতিত।

মহা উদ্ধারণ নাম ধর কর হিত।।

.....

ভক্তিহীন জ্ঞানহীন আমি পাপাচারী।

.....

ভূভার হরণ জন্য তব অবতার।

এবার হর হে হরি গোলকের ভাব।।

.....

সদ্যপি ভর্ৎসনা করি তবু তুমি সাই।

জিহ্বা মন বাক্য তুমি গোলক গোঁসাই।।''[৫৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর গোলক কীর্ত্তনীয়ার মোট রূপে দুঃখ-যন্ত্রণাকে বয়ে দিয়ে তার সব সংকট থেকে মুক্তি দেন। এবং এ প্রসঙ্গে এও বলেন জগতের মোটও তিনি বয়ে সংকট ঘুচাবেন একথা ব্যক্ত করেন।

.....

''ঠাকুর বলেন বাছা নহে তো কপট।

আমার মত ঠাকুরে বহে তোর মোট।।

জগতের মোট বহি ঘুচাই সংকট।

দেরে মোট উঠাইয়া বহি তোর মোট।।

গোলক বলিছে মোট দিব দয়াময়।

হেন শক্তি দেহ যদি তবে দেওয়া যায়।।

মোট যদি নিতে চাইলে বলিলে শ্রীমুখে।

তবে মোট নিতে হবে এই দায় ঠেকে।।

তুমিত করুণাময় এবে গেল বোঝা।

নিজ শক্তি প্রকাশিয়া তুলে লও বোঝা।

ঠাকুর বলেন ভাল ঠেকাইলি দায়।

নিলাম এ বোঝা গা তুলিয়া বয়।।

গোলকের দেহে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল।

গেল রোগ সে গোলক উঠিয়া বসিল।।

.....

প্রভু বলে যা গোলক যা এখন ঘরে।

ভক্তিগুণে বন্দী রহিলাম তোর ঘরে।।

গোলক বলিছে আর নাহি দিব ছাড়ী।

ভক্তি নাই দয়া করে চল মম বাড়ী।।

.....

ঠাকুরে প্রণাম করি গোলক উঠিল।

হরিধ্বনী দিয়া গৃহে হাটিয়া চলিল।।

.....

গোলক হইল ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত।

পাসরিতে নারে গুণ সদা করে ব্যক্ত।।

দিবা বিভাবরী হরিনাম সংকীর্ত্তন।

হরিচাঁদ প্রীতে হরি বলে সর্ব্বজন।।

হরিচাঁদ লয়ে যেত ভক্তগণ সাথে।

মাঝে মাঝে যান সে গোলকের বাড়ীতে।”[৫৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে গোলক কীর্ত্তনীয়া পরপোকার করতে প্রস্তুত হন। কীভাবে পরউপকার করা যাবে সেই শিক্ষা হরিচাঁদ ঠাকুর তার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের দিতেন ও সেই আজ্ঞা

অনুসারে ভক্তগণ পরউপকারে রত হতেন। গোলক কীর্ত্তনীয়াকে ঠাকুর যেভাবে শিক্ষা দেন সেই সমস্ত শিক্ষা নীতি তুলে ধরলাম। প্রথমে গোলক কীর্ত্তনীয়াকে হরিচাঁদ ঠাকুর যা বললেন—

''ওড়াকাঁদি গোলক কীর্ত্তুনে আসে যায়।
ঐকান্তিক ভক্তি হরিঠাকুরের পায়।।
একদা শ্রীহরি বসি পুষ্করিণী তীরে।
গোলক বসিল গিয়া ঠাকুর গোচরে।।
.....
অমূল্য ধনের মূল্য কিছু না পাইলি।।
.....
আজ্ঞা কর কি কার্য্য করিব শুনি তাই।।
ঠাকুর কহেন বাছা ধর্ম্ম কর্ম্ম সার।
সর্ব্ব ধর্ম্ম হতে শ্রেষ্ঠ পর উপকার।।
কীর্ত্তনীয়া বলে হে তারক ব্রহ্ম হরি।
আমি কি পরের ভাল করি বারে পারি।।
মহাপ্রভু বলে বাছা বলিরে তোমায়।
কেহ যদি ঠেকে কোন আধি ব্যাধি দায়।।
ওড়াকাঁদি আসিতে যে করে মনন।
এ পর্য্যন্ত আসিতে দিও না বাছাধন।।
আমাকে ভাবিয়া যাহা তোর মনে আসে।
তাহাই বলিয়া দিসে মনের হরিষে।।
তাহাতে লোকের হবে ব্যাধি প্রতিকার।
ইহাতে হইবে তোর পর উপকার।।
যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই খেতে দিস।
হরিনামে মানসিক করিতে বলিস।।
রোগ মুক্ত হলে সেই মানসার কড়ি।
রোগা ভক্তি কলিতে হয়েছে বড় ব্যক্ত।

রোগমুক্ত হবে সবে হবে হরি ভক্ত।।

.....

নিজে না হইও লোভী অর্থের উপর।

তাহা হলে করা হবে পর উপকার।।''[৫৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে গোলক কীর্ত্তনীয়া পর উপকারে রত হন। এবং দক্ষিণ দেশ গোলক কীর্ত্তনীয়ার দ্বারা 'হরিনাম' গানে মত্ত হন। কবির ভাষায়—

''শুনিয়া গোলক বড় হরষিত হয়ে।

সারিতে লাগিল ব্যাধি হরিনাম দিয়ে।।

অনেক লোকের ব্যাধি হইয়া মোচন।

হরিভক্ত হয়ে করে হরি সংকীর্ত্তন।।

রাউৎখামার আর মল্লকাঁদি গ্রম।

চারিদিকে সব লোকে করে হরিনাম।।

এই রূপে ভক্ত সব হইতে হইতে।

প্রকাশ হইল ধর্ম্ম দক্ষিণ দেশেতে।।

বর্ণি বাসুড়িয়া দলোগুণি আট জুড়ী।

পাটগাতী কলাতলা গ্রাম বড়বাড়ী।''[৫৯]

এই যে ভক্তদের উদ্ধার করেন হরিচাঁদ ঠাকুর রোগ থেকে তারা হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণকারী ভক্তদের দ্বারাই তিনি মানুষের সমাজে পরউপকার করেন। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুর সমাজে 'হরিনাম' দ্বারা আত্মজ্ঞান দান করেন এবং শারীরিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাকে সম্পূর্ণরূপে মানবতায় প্রতিষ্ঠা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর শারীরিক মানসিক উভয়দিকে চিকিৎসা করে পূর্ণ মনষ্যত্ববোধে মানুষকে পূর্ণতা দেন। এমনকি তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ও শিক্ষা দেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরকে খুব ভাল বাসতেন। তিনি ছিলেন হরিচাঁদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্যতম। দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরকে রোগীরা বিরক্ত করে দেখে খুব কষ্ট পেতেন। আর রোগ যদি না থাকে সংসারে তাহলে হরিচাঁদ ঠাকুরকে কোন রোগাভক্ত বিরক্ত করবে না এই অভিপ্রায়ে দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরকে

বলেন সংসারের রোগ নিয়ে তিনি একা ভুক্ত ভোগী হতে চান। হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বৈরাগীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেন ও বলেন যে তোর বাঞ্ছাপূরণ হবে বার বছর পর। দশরথ বৈরাগীকে পরীক্ষাও করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত দশরথের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও ভক্ত দশরথের কথাতে ব্যক্ত হয় গভীর হৃদয়ার্ত্তির দিক। দশরথ বৈরাগী নিজেই যেচে নেয় রোগ হরিচাঁদ ঠাকুরের আজ্ঞানুসারী হয়ে জীবন যাপন করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথকে মহাভগবত ভক্ত রূপে পরিচিত হওয়ার শিক্ষা দেন। দশরথ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশমত সকল অত্যাচার সহ্য করেও তার জীবনচর্যা থেকে বিচ্যুত হন নি। শেষে ঠাকুর তাকে মহাভাগবত ভক্ত রূপে অ্যাখ্যা দেন। দশরথ হরিচাঁদ বৈরাগী হরিচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছা প্রকাশ, রোগ ভোগের নির্দেশও তার পালন করার আজ্ঞা করেন। কবির ভাষায়—

দশরথের কথায়—

‘‘সাধুসুত দশরথ উপাধি বৈরাগী।
রাউৎখামার বাসী মহা অনুরাগী।।
প্রভু যবে লীলাখেলা করে এই মতে।
এই সময় দশরথ প্রেমে যায় মেতে।।
প্রভুর সঙ্গেতে ফিরে সেই দশরথ।
হইলেন প্রভু প্রিয় পরমভকত।।
প্রভু স্থানে আসে লোক হয়ে ব্যাধিযুক্ত।
প্রভুর আজ্ঞায় তারা হয় ব্যাধিমুক্ত।।
তাহা দেখি মনে দুঃখী দশরথ ভক্ত।
রোগা ভক্ত প্রভুকে করয় বড় ত্যক্ত।।
মনোদুঃখে দশরথ গিয়া প্রভু স্থানে।
কর জোড়ে নিবে দিল প্রভুর চরণে।।
বহু লোক রোগযুক্ত হয়ে বহু দেশে।
রোগে মুক্তি পাইতে তোমার ঠাই আসে।।
আত্মসুখী রোগাভক্ত ব্যাধি মুক্তে তুষ্ট।
তাহাতে আমার মনে হয় বড় কষ্ট।।

আমার মনের ইচ্ছা যত লোক রোগী।

সবাকার রোগলয়ে আমি একাভোগী।।

ওহে দয়াময় হরি আজ্ঞা কর তাই।

সবাকার রোগ লয়ে একা কষ্ট পাই।।

রোগী না থাকিলে ভবে কেহ আসিবে না।

তোমাকে ওরুপ ত্যক্ত কেহ করিবে না।।

অহৈতুকী ভক্তিমান ভক্ত আছে যারা।

প্রেমের পিপাসু হয়ে আসিবেক তারা।।

সেই সঙ্গে হবে সুখে প্রেম আলাপন।

দয়া করি বল নইলে ত্যাজিব জীবন।''[৬০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কষ্টকে দশরথ বৈরাগী নিজে বহন করতে চাইছেন। যারা মূলত রোগমুক্তির পর হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভক্ত হন। সেই জন্য রোগকে নিজে বহন করতে চান। হরিচাঁদ ঠাকুরকে যারা অহেতুক ভাবেই আত্মসমর্পণ করে ভালোবাসে তাদের সঙ্গে তিনি সুখে থাকতে পারবেন অভিপ্রায়ে ভক্ত দশরথ সেধে রোগ যুক্ত হন। হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্ত দশরথের ইচ্ছা পালন করেছে পরীক্ষার মাধ্যমে। আর ভক্ত দশরথও সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভক্ত মহাভাগবতে পরিণত হয়েছেন।

''প্রভু বলে দশরথ একি কথা কও।

সংসারের রোগকি উঠায়ে নিতে চাও।।

কর্ম্মক্ষেত্রে সংসারেতে কর্ম্মমহাবল।

সকলেই পায় কর্ম্ম অনুযায়ী ফল।।

তবে তোর বাঞ্ছাহেতু দিব তোরে রোগ।

বার বৎসরের পরে হবে তোর ভোগ।।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা হইল সন্তুষ্ট।

বার বছরের পর হল তার কুষ্ট।।

ঠাকুর বলেন বাছা আর কিবা চাও।

সংসার ছাড়িয়া এবে ভিক্ষা করে খাও।।

কতদিনে এই ভাবে ভিক্ষায় প্রবৃত্ত।

আজ্ঞামতে পরে নিলে অযাচক বৃত্ত।।

.....

বাক বন্ধ করিয়া থাকিবা ছয়মাস।

মরিলেও কিছু নাহি করিও প্রকাশ।।

.....

যে ডোর কপিন কন্থা করিবা ধারণ।

অন্য বস্ত্র কপিন কন্থানা পরিবা কদাচন।।

ছয় মাস গত হলে দিবসে বেড়াইও।

ভাবের ভাবুক হলে তার বাড়ি যেও।।

নিশিতে থাকিয়া তার সঙ্গে বল কথা।

তাহা ভিন্ন অন্য কথা না কহিও কোথা।।''[৬১]

মানুষ যে অন্তরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন আর ঠাকুর মানুষের অন্তরের প্রার্থিত প্রার্থনাকে সর্বদাই পূরণ করেন একথা ভক্ত দশরথকে হরিচাঁদ ঠাকুর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। মানুষ সর্বদাই আত্মসুখ সন্ধান করেন। এই যে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদশরথ কিন্তু নিজের আত্মসুখকে বর্জন করেছে হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভালোবেসে। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের থেকে দশরথের চিত্ত ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের সুখ সন্ধানী চিত্ত। এখানে দশরথ বৈরাগী সকলের থেকে অন্যরকম ভক্ত। দশরথ বৈরাগীকে হরিচাঁদ ঠাকুর মহাভাগবত বলে বর্ণনা করেছেন।

ভক্ত দশরথের হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভাবালাপ প্রসঙ্গটি কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

''তোর যে ভাবনা আছে বহুদিন হতে।

ভাবিলে ভাবনাসিদ্ধি পারিলে ভাবিতে।।

যে যাহা ভাবনা করে ঠাকুরের স্থান।

অবশ্য অভীষ্ট পূর্ণ করে ভগবান।।

.....

নিঃস্বার্থ ভাবেতে যেই পর উপকারী।

অকামনা শুদ্ধ প্রেম তারে ব্যাখ্যা করি।।

আত্মসুখে কর্ম্ম করে তারে বলে কাম।

পর সুখে কর্ম্ম করে ধরে প্রেমনাম।।

মম কষ্ট ভেবে মম সুখের নিমিত্তে।

তব ইচ্ছা সদা পর উপকার অর্থে।।

.....

ভাগবত তুমি তাহা জানিলাম সত্য।

তোমার প্রেমেতে আমি হইনু বিক্রিত।।

সর্ব্বত্যাগী সর্ব্বরোগী সর্ব্বভোগী যেই।

মাধুর্য্যের পাত্র মহাভাগবত সেই।।

সর্ব্বত্যাগ করি বাছা পরিলে কৌপিন।

সর্ব্বরোগী সর্ব্বভোগী হলে উদাসীন।।

কি ব্যাখ্যা করিব তোরে নাহি বলাবল।

কি ফল ব্যাখিব তোরে নাহি ফলাফল।।

.....

দশরথ বলে আমি বড়ই জঘন্য।

তব বাক্য সত্য আমি আজ হতে ধন্য।।

অযাচক বৃত্তি ভিক্ষা প্রবৃত্ত হইল।

দেশে দেশে অইভাবে ভ্রমিতে লাগিল।''[৬২]

দশরথ বৈরাগীর সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের যে ঐকান্তিক প্রেমময় সম্পর্ক সে পরিচয় পাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, দশরথ বিশ্বাস, সূর্য্য নারায়ণ ও তারকচন্দ্র সরকারের আত্মীক পরিচয়টিও জ্ঞাত হওয়া যায়। অযাচক বৃত্তি অবলম্বনের সময় একদিন দশরথকে পীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, সেই সময় মনে মনে প্রার্থনার কথা বলেন হরিচাঁদ ঠাকুরকে। মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস মল্লকাঁদি থেকে কালিনগরে বাস করলে সেই বাড়িতে একদিন ভক্ত দশরথ যান ও তাদের সঙ্গে ভাবালাপ করেন। আর সেই সঙ্গে তারকচন্দ্র সরকার ছিলেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

.....

''একদিন ঠাকুর বলেন মৃত্যুঞ্জয়।

করগে কালীনগরে বসতি আশ্রয়।।

ভিটা ছাড়ি করে বাড়ী সে কালীনগর।।

.....

দশরথ উপনীত দিবা অবসানে।

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ সূর্য্য নারায়ণ।

তার মধ্যে হইলাম আমি একজন।।

.....

..... কহেন মৃত্যুঞ্জয়।

সেধে সেধে নিলে ব্যাধি হইলে আতুর।

ঠাকুর পরীক্ষা করে সহ্য কতদূর।।''[৬৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সমসাময়িক ভক্তগণের সাহায্যে ঠাকুর তৎকালে যে সমাজ সংগঠন করেছিলেন তার পরিচয় পাই। দশরথ বিশ্বাসের ভক্ত হবার পর। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের মধ্যে গোস্বামী দশরথ বিশ্বাস প্রধান ভক্তদের মধ্যে পড়ে। দশরথ বিশ্বাস হরিঠাকুরের কাছে যায় রোগারোগ্য কামনায়। দশরথ বিশ্বাস রোগমুক্ত হনও হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে তিনি বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করেন। দশরথ বিশ্বাস ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভক্ত। ফলে তিনি শাস্ত্রমতানুযায়ী যথাবিধি স্নান, পূজা, তিলক ধারণ, মালা জপ করতেন এবং স্নান আহ্নিক নিয়ম মত পালন করতেন। এবং নিরামিশ আহার করতেন। এহেন বিধি ভক্ত ছিলেন দশরথ বিশ্বাস। এবং এও তিনি মেনে নিতে পারছেন না যে হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্বয়ং হরি আবির্ভূত বলে। তাই তিনি দেখে তারপর মানতে চাইলেন। আর হরিচাঁদ ঠাকুরের চরিত্রাদর্শকে একটি পূর্ণ মানবসত্তার আধারকে আমরা পাই। তৎকালীন সময়ে গুরুবাদ ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে সমাজে গুরুদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর এই গুরুদের মনুষ্যত্ব হীনতাকে ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুদের আলাদা গুরুত্ব দেন নি। তিনি যথার্থ ভাবেই সমাজের কল্যাণের জন্য সমাজের ব্যাভিচার নীতির সবগুলিকে বর্জন করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুদের কোন আলাদা শ্রেণিতে বিভক্ত করেন নি। হরিচাঁদ

ঠাকুর মানুষকে পূর্ণ মানবতা বোধে উন্নীত হওয়ার জন্য যা কিছু কর্মের প্রয়োজন তার সকল কিছু করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর পূর্ণ জ্ঞানালোক সম্পন্ন মানুষ তার পরিচয় আমরা এই দশরথ বিশ্বাসের সঙ্গে তার কথপোকথন থেকে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি। দশরথ বিশ্বাসের বাড়িতে হরিনাম করার জন্য অভিযোগ করেন নায়েব মহাশয়কে গ্রামবাসী মানুষ যারা 'হরিনাম' কারী ভক্ত তথা 'মতুয়া'দের বিরুদ্ধেবাদীরা। নায়েব হরিসংকীর্তনের সময় ভক্ত দশরথের বাড়িতে আসেন। এবং পরে ভক্ত দশরথকে অত্যাচার জরিমানা করেন। নালিশ যায় সাহেব কুঠিতে। ডিক সাহেবের কুঠিতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের যান। নিয়ে অত্যাচারের বিচারের জন্য মহিলাদের নিয়ে বিচার সভা ও মহিলা কাছারী করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থ থেকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করছি। কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

দশরথ বিশ্বাসের চরিত্র—

''দশরথ নামে সাধু পদ্মবিলা বাসী।
তত্ত্বজ্ঞানী হরিনামে মত্ত অহর্নিশি।।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ রতন।
করে একাদশী ব্রত তুলসী সেবন।।
তিন সন্ধ্যা মালা জপ তিলক ধারণ।
হরিনাম ছাপা অঙ্গে অতি সুশোভন।।
নিত্য নিত্য প্রাতঃ কৃত্য স্নানাদি অর্পণ।
গুরু পূজা কৃষ্ণ পূজা নৈবিদ্য অর্পণ।
পক্ষে পক্ষে একাদশী শ্রীহরি বাসর।
স্তব পাঠ নাম পাঠ নাহি অবসর।।
চৈতন্য চরিতামৃত পঠে ভাগবত।
সাধু সেবা মহোৎসব করে অবিরত।।
দিবাহারী এক সন্ধ্যা নাহি দ্বিভোজন।
আতপ তণ্ডুল অন্ন লাবড়া ব্যঞ্জন।।
তৈল মৎস ত্যাগী ভক্ষে দিনে একবার।
রাত্রে কিছু ফলাহার কভু অনাহার।।

.....

দৈবে ব্যাধি যুক্ত হল কার্ত্তিক মাসেতে।

জ্বর হয়ে ভুগিলেন কতদিন হতে।''[৬৪]

দশরথের বিশ্বাসের রোগ সংবাদ ও ওড়াকাঁন্দি পৌঁছানো কথা—

''আরক পাচন বটী কত খাইতেছে।

ক্রমশঃ জ্বরের বৃদ্ধি দুর্ব্বল হতেছে।

ভাল বৈদ্য চিকিৎসক কতই আসিল।

বাছিয়া বাছিয়া কত ঔষধ খাইল।।

তবু রোগ শান্তি নাই হইল কাতর।

শক্তি নাই যষ্টিমাত্র চলিতে দোসর।।

প্রচলিত হইয়াছে হরি বলা মত।

কত লোক ওড়াকাঁদি করে যাতায়াত।।

.....

না দেখিলে চক্ষুকর্ণ বিবাদ না ঘুচে।

অবশ্য যাইব দেখিবার ইচ্ছা আছে।।

.....

রহিলেন গিয়া বুদ্ধি মন্তের আশ্রমে।।

ঠাকুরের কথা তথা সকল শুনিল।।

শুনিয়া অন্তরে বড় ভক্তি জনমিল।।

.....

হরি হরি বলি উতরিল ওড়াকাঁদি।

.....

ঠাকুর বলেন বাছা কি নাম তোমার।।

দশরথ বলে আমি বড় দুরাচার।

নাম মোর দশরথ পদ্মবিলা বাস।।''[৬৫]

দশরথ বিশ্বাসকে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজের কথা বলছেন ও তার শুদ্ধ হওয়ার জন্য যে ক্রিয়া

প্রণালীকে মনে প্রাণে পালন করেছেন সেই বর্ণনা করে হরিচাঁদ ঠাকুর নিজেকে এক অতি তুচ্ছ মানুষ বলে বর্ণনা করছেন। কেননা দশরথ বিশ্বাস হরিচাঁদ ঠাকুরের সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করতেন। দশরথ বিশ্বাস হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসলে সেই কথা ব্যক্ত করেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের দশরথ বিশ্বাসের কাছেকে নিজের কথা তাচ্ছিল্য ভাবে বলেন—

''প্রভু বলে তুমি তো দশরথ বিশ্বাস।
তুই তো বিশ্বাস আমি বড় অবিশ্বাস।
তন্ত্রে মন্ত্রে শৌচাচারে নাহয় বিশ্বাস।।
কেন বা আসিলি বাছা আমার নিকটে।
তুই শুদ্ধাচারী মোর শৌচ নাই মোটে।।
তিন বেলা সন্ধ্যাকর আর স্নানাহ্নিক।
স্নান পূজা সন্ধ্যাহ্নিক মোর নাহি ঠিক।।
কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।
মোর ঠাই এলি বাছা কিসের কারণ।
কহ শুনি মনো কথা বুঝি তোর মন।।
প্রকাশিয়া বল শুনি ওরে দশরথ।
শুদ্ধাচারী সাধু তোর কিবা মনোরথ।।
কি জানি কি ওড়াকাঁদি না হয় প্রত্যয়।
কোথাকার হরি এল ওড়াকাঁদি গায়।''[৬৬]

হরিচাঁদ ঠাকুর ছিলেন সত্যিই মানব দরদি ও মানবতার পূজারী। হরিচাঁদ ঠাকুরের এহেন কথায় শব্দগুলির মমার্থ হল আত্মসংস্কার জন্য সমস্ত বেদ বিধির প্রয়োজন হয় মানুষের। আত্মসংস্কার করার জন্য মানুষের হরিচাঁদ ঠাকুর। সর্বদাই মানুষের উপায় নির্ধারণ করতেন। শাস্ত্রগ্রন্থ নির্দেশানুসরণ মানুষ করে আত্ম চৈতন্য লাভ করার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু হৃদয় পবিত্র দরকার মানুষের প্রথমে। বহিরাগত শুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয় শুদ্ধির কথাই পাব হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে ভক্ত দশরথ বিশ্বাসের ভাবলোপে।

দশরথ বিশ্বাসের আত্মসমর্পণ ও হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসায় দশরথের সকল মানসিক

শারীরিক ব্যাধি মুক্তি। দশরথ বিশ্বাস আত্মসমর্পণ করেন এভাবে—

.....

''শুনি দশরথ পড়ে পদে লেটাইয়ে।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহে চরণে ধরিয়ে।।
সারে বা না সারে রোগ তাতে নাহি দায়।
দয়া করি হরি মোরে রেখ রাঙ্গা পায়।''[৬৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যাধিমুক্তি দশরথের—

''প্রভু কহে এত তোর সাধন ভজন।
শুদ্ধাচারী বৈরাগীর ব্যাধি কি কারণ।।
প্রভু কহে দশরথ তোমারে জানাই।
শৌচাচার করে তোর হল শুচিবাই।।
স্নান না করিয়া কিছু খাওনা কখন।
স্নান না করিয়া অদ্য করগে ভোজন।।
কল্য ভাত রাঁধিয়া রেখেছে জল দিয়া।
কাঁচা ঝাল দিয়া সেই ভাত খাওগিয়া।।

.....

দশরথে দেহ কাঁচা লঙ্কা পান্থা ভাত।।
জগন্মাতা দিল অন্ন আর কাঁচা লঙ্কা।
দশরথ বলে মোর গেল মৃত্যু শঙ্কা।।
কিছার এ্যহিক জ্বর ভবরোগ গেল।
অন্ন পাত্র ধরি সাধু মস্তকে রাখিল।।
বহুদিন অরুচি না পারে কিছু খেতে।
অদ্য এত রুচি নাহি পারে ধৈর্য্য হতে।।
বড়ই বেড়েছে রুচি বড়ই সুস্বাদ।
সাদু কহে আর বার দেহ মা প্রসাদ।।''[৬৮]

দশরথ বিশ্বাসের সঙ্গে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবালাপ থেকে বোঝা যায় বাহ্য শৌচের দ্বারা

কখনোই ভগবানকে পাওয়া যায় না ভগবানকে পাওয়া যায় আত্ম শুদ্ধ হলে। আর আত্ম শুদ্ধ হতে হলে সংসার ত্যাগের প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকে আত্ম শুদ্ধ হওয়া যায় ও ভগবানকে পাওয়া যায়। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বিশ্বাসকে গৃহধর্ম পালনের জন্য বিবাহ করার নির্দেশ দেন। তারপর স্নান পূজার জন্য নিয়মের দরকার নেই হরিনাম কর। হরিনাম করে সমাজের উপকার করার জন্য নির্দেশ দেন। সংসার করার জন্য বাসাবাড়ি করতে নির্দেশ দেন। ক্রম অনুযায়ী ঠাকুরের নির্দেশাবলী তুলে ধরলাম আলোচনার জন্য।

হরিচাঁদ ঠাকুরের আত্মদর্শন ছিল বাস্তবতাবাদী। সমাজে সংসার জীবন পালনও ধর্ম পালনের মধ্যেই ভগবানকে পাওয়ার সন্ধান দেন। তাই সমাজ মানুষও জীবনের মূল ভিত্তির বাসভূমি সংসারকে গুরুত্ব দিলেন। দশরথ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর—

.....

''ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে পরেছ কৌপিন।
কৌপিনের মহিমা না জানি এতদিন।।
তিন বেলা স্নান করে কে হয় বৈরাগী।
স্নান করে পানিকৌড়ি সেও কি বৈরাগী।।
বিবেক বৈরাগ্য তাকি বাহ্য শৌচে হয়।
বনে বনে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়।।
স্নান বল কারে শুধু উপরেতে ধোয়া।
আত্ম শুদ্ধ না হলে কি যায় তারে পাওয়া।''[৬৯]

হরিচাঁদ ঠাকুর দশরথ বিশ্বাসকে আত্মদর্শন করালেন। সে যেন তার কৃত কর্মকে দেখতে পেলেন। দশরথ বিশ্বাস ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবালাপ এর মধ্যে তাকে সংসার ধর্ম পালনের নির্দেশও সমাজের উপকার করার নির্দেশ দেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ—

.....

''আজ হতে তোর আর স্নান পূজা নাই।।
প্রয়োজন নাই আর ডুবাইতে জলে।
ডংকামেরে বেড়া গিয়ে হরি হরি বলে।।
হরিনাম ধ্বনি দিয়া মাতা গিয়া দেশ।।

শোন বাছা দেই তোরে এক উপদেশ
মালাবতী নামে লক্ষ্মকান্তের ভাগিনী।
তারে বিয়া কর গিয়া সে তোর গৃহিনী।।
আমিও বলিয়া দিব ভগিনী যে দিবে।
.....
প্রভু বলে যষ্ঠি আর হবে না ধরিতে।
ধরিয়া ত্রিশূল শিঙ্গা রক্ষা কর শীল।
যৈছে বোর ধান্য হয় যৈছে হয় তিল।।
কোন মন্ত্র লাগিবেনা যৈছে হরিনাম।
বাসা কর গিয়া বাছা পাতলার গ্রাম।।
তাহাতে যে ধান্য তিল পাইবা বৎসর।
সংসার খরচ কার্য্য চলিবেক তোর।।
প্রভুকে প্রণামী সাধু চলিল হাটিয়া।
পুষ্করিণী জলে যষ্ঠি দিলেন ফেলিয়া।।
নিজবাটী আসিয়া কহিল ভ্রাতাগণে।
বিবাহ হৈল শেষে মালাবতী সনে।।"[৭০]

বাড়ি করার পরামর্শ দেন ও সারাবছর সংসার খরচের জন্য খাবার যোগাড় করার কথাও বলে দেন। এভাবে আরো বহু মানুষ আসত যারা পুত্র কামনায় হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে আসতেন। ঠাকুর তাদের ব্রহ্মচর্য পালনের নির্দেশ দিতেন সময় ধরে। পরে সংসার ব্রত রক্ষায় পুত্র লাভ ঘটত। হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরিনাম' করার জন্য নারীর গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। তিনি সংসার ধর্ম পালনের মধ্যেই সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম পালন করার নীতি প্রচলন করেন। নারী ব্যাতিত সংসার জীবন সম্পূর্ণভাবেই অচল। নারীও পুরুষ উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেন। হরিচাঁদ ঠাকুরকে অনেক ভক্তগণ তাদের নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং সেখানে নারী পুরুষ উভয়েই মিলিতভাবে ঠাকুরের পরিচর্যার সহায়ক হতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর উভয়কেই 'হরিনাম' করার অধিকার দেন। আর নারী ও পুরুষ উভয় শারীরিকভাবে ভিন্ন হলেও নারীরা ভক্তি যোগও জ্ঞানযোগে পুরুষের সমকক্ষ হোক এটা তিনি মনে প্রাণে চাইতেন।

সমাজে পুরুষ ও নারী সহাবস্থান করলে শুধু পুরুষ শিক্ষা প্রাপ্ত হলে নারী থাকে বঞ্চিত। আর একটি দিকে জ্ঞানা লোক জ্বললে অপর পক্ষটি থাকে ততটাই অন্ধকার। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের সমকালেই গুরুচাঁদ ঠাকুর শিক্ষার প্রসার ঘটান সেখানে পুরুষও নারী উভয়ের জন্য তিনি ইস্কুল স্থাপন করেন। তেমনি হরিচাঁদ ঠাকুর পুরুষের আত্মদর্শনের জন্য যেমন হরিনাম করে চরিত্র পবিত্রতার কথা বলেন তেমনি সেই সময়ের অনেক ভক্ত নারীর পরিচয় পাওয়া যায় যারা ছিলেন একনিষ্ঠ সাধিকা নারী। ভক্তির জগতে হয়ত সে নারী রূপে পরিচিত কিন্তু ভগবানের কাছে সে ভক্ত। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে তাদের নারীরাও আসত 'হরিনাম' সংকীর্ত্তন আসরে। এখানে নারীরা শুধুমাত্র গৃহকর্ম নিপুণ তারা স্বামীর যোগ্য সহধর্মীনি হয়ে স্বামীর সঙ্গে গৃহধর্ম পালন করেন। 'দশরথের বাড়িতে নায়েব এর অত্যাচার' অধ্যায়ে দেখা যায় নারীরা 'হরিনাম' সংকীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করেন। এবং সকল নারীই হরিনাম করেন। এই অভিযোগ গ্রামবাসী অনেক লোক নায়েব মহাশয়কে করেন। নায়েব মহাশয়কে গ্রামবাসী যারা হরিনামে তখনও মত্ত হয়নি তারা হরিনামের সময় হরিনামের কার্যাবলীকে দেখাতে ও বিচার করার জন্যে নিয়ে আসেন। মহাসমাদরে নায়েব মহাশয়কে দশরথ অন্যান্য ভক্তগণ হরিচাঁদ ঠাকুরের সামনে বসান। সংকীর্ত্তন সময় নায়েব নারীদের ক্রিয়াকর্ম ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে দশরথ বিশ্বাসকে ক্রোধান্বিত হয়ে মারেন ও জরিমানা করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর দশ টাকা জরিমানার জায়গায় ডবল কুড়ি টাকা দিতে বলেন দশরথ বিশ্বাসকে। সেই টাকাই নায়েবকে দেন। আর মূলত গ্রামবাসীদের অভিযোগ হেতু হরিচাঁদ ঠাকুরকেই মারার জন্য কাছারিতে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু দশরথ বিশ্বাস সেই ক্ষেত্রে বাধা দিলে নিজেই সেইপ্রহার সহ্য করেন। ঘটনা পরম্পরাক্রমে কবির ব্যক্ত করা সেই অত্যাচার কাহিনিটিকে আলোচনার জন্য তুলে ধরলাম।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ হরিনামকারী ভক্তদের বিরুদ্ধে এই বলে যে নারীরা সকলে হরিনাম করেন। এমনকি কুলবধূরাও হরি বলে হরিবোলা দলে মিশে যায়—

.....

''মাতিল অনেক লোক প্রেমে উতরোল।

ঘাটে পথে যেতে যেতে শুতে হরি বোল।।

গ্রামের পাষণ্ডী যারা বাধ্য নাহি তায়।

কাছারিতে নায়েবের কাছে গিয়া কয়।।

কি মত এ গ্রামে আনিয়াছে দশরথ।

গ্রাম্য লোক নষ্ট হবে থাকিলে এ মত।।

.....

দিবা নিশি হরিনাম পেয়েছে কি মধু।

রাত্রি ঘুম পাড়া নাই এ কেমন সাধু।।

ওড়াকাঁদি হতে হরি ঠাকুরকে আনে।

সে ঠাকুর যেন কি মোহিনী মন্ত্র জানে।।

বুঝিয়াছি ইহারা নিশ্চয় জানে যাদু।

হরি বলে যায় চলে সতী কুল বধূ।।

এ গ্রামে লেগেছে বাবু বড় হুলস্থূল।

গ্রাম্য নমঃশূদ্রদের গেল জাতি কুল।।

কাশ্যপ মুনির বংশ গোত্রজ কাশ্যপ।

দশরথ হতে সেই মান্য হয় লোপ।।

ইহার বিচার কর আনিয়া কাছারী।

এই কাণ্ড আপনাকে দেখাইতে পারি।।

ঠাকুর আছেন দশরথের ভবনে।

সকল প্রত্যয় হবে দেখিলে নয়নে।।

রাত্রিকালে হুড়াহুড়ি শুনা যায় শব্দ।

ছয় সাতদিন মোরা হয়ে আছি স্তব্ধ।।

নায়েব বলেছে এবে যাও গো সকলে।

আমাকে লইয়া যেও কীর্ত্তনের কালে।''[৭১]

এ হেন ভাবে গ্রামবাসীগণ অনেকে মিলে হরিভক্তদেরও মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এই যে কীর্ত্তন করার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন সেই কীর্ত্তনের সময়কার পরিবেশটি আলোচনা করে ও নায়েব মহাশয়ের ক্রোধিত রূপের প্রকাশ ও প্রতিকার ব্যবস্থাকে তুলে ধরা হল। কীর্ত্তনের পরিবেশটি এরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন কবি—

‘‘সূর্য্যদেব ডুবে গেল সন্ধ্যাকাল এল।
নাম গান কীর্ত্তনেতে সকলে মাতিল।।
পুরুষ যতেক বসা পীড়ির উপরে।
মহাপ্রভু বসেছেন গৃহের ভিতরে।।
দরজা নিকটে খোল করতাল বাজে।
ঠাকুর আছেন বসি কীর্ত্তনের মাঝে।।
রামাগণ অনেক বসেছে গৃহভরা।
মাঝে মাঝে হুলুধ্বনি দিতেছে তাহারা।।
কেহ বা প্রভুর অঙ্গে দিতেছে বাতাস।
ঠাকুরের ঠাই বসি পরম উল্লাস।।
নাম গানে সবে প্রেম বন্যা বয়ে যায়।
রামাগণে বামাস্বরে হুলুধ্বনি দেয়।।
গৃহে বসিয়াছে রামাগণ সারি সারি।
প্রভু পার্শ্বে কাঁদিতেছে মালাবতী নারী।।
কোন নারী ঠাকুরের চরণে লোটায়।
কোন নারী পদ ধরি গড়াগড়ি যায়।।
কোন নারী কেঁদেছে হা হরি জগন্নাথ।
শ্রীপদ ধোয়ায় কেহ করি অশ্রুপাত।।’’[৭২]

কীর্ত্তন সময় গ্রামীরা নায়েবকে সঙ্গে করে দশরথের বাড়িতে আসেন ও নায়েরকে সমাদরে বসায়। ও নায়েব এর ক্রোধ প্রকাশ ও অত্যাচার বিবরণ—

‘‘হেন কালে গ্রামীরা নায়েবে লয়ে যায়।
বাড়ীর উপরে নিয়া তাহাকে বসায়।।
দুইভাগ করিয়া পাড়ার লোক সবে।
চৌকি পাতি সমাদরে বসায় নায়েবে।
যে স্থান হইতে ঠাকুরকে দেখা যায়।
এমন স্থানেতে নিয়া নায়েবে বসায়।।

রামাগণ বাহ্যজ্ঞান হারা সবে ঘরে।

নায়েব বসিয়া সেই ভাব দৃষ্টি করে।।

অজ্ঞান হইয়া কেহ প্রেমে গদ গদ।

হা নাথ বলিয়া কেহ শিরে ধরে পদ।।

চতুর্দ্দিকে নারী মালা মালাবতী বামে।

মৃদুস্বরে হরি বলে মত্ত হয়ে প্রেমে।।

.....

.....

প্রেমে দ্রবীভূত নয় পাষণ্ড হৃদয়।

বিশেষ গ্রামী লোকের ছিল অনুরোধ।

তাহা দেখি নায়েবের উপজিল ক্রোধ।।

.....

মজাইবি দেশশুদ্ধ করে নিলি শুরু।।

.....

কি বুঝিয়া ছেড়ে দিলি ঘরের রমণী।।

এত মেয়ে লোক কেন দেখি তোর ঘরে।

ঠাকুরে লইয়া কেন এত প্রেম করে।।

ভাল ভাল অই যদি ঠাকুর হইবে।

মেয়েদের সঙ্গে কেন এ রঙ্গ করিবে।।

দশরথ বলে বাবু মোর দোষ কিসে।

যার যার নারী সেই সেই লয়ে আসে।।

.....

প্রভুকে আনিনু আমি হইয়া সন্তোষ।।

ঠাকুর আছেন মত্ত হরিনাম গানে।

পাষাণ গলিত হয় এ নামের গুণে।।

মেয়েরা এসেছে সব নাম আকর্ষণে।।

.....

.....

নায়েব কহিছে ওরে ভণ্ড তপস্বী।

যাহা শুনিয়াছি তাহা দেখিলাম আসি।।

.....

নারী লোক সঙ্গে করে হরিনাম গান।

শীঘ্রভণ্ড তপস্বীরে বাহিরেতে আন।।

.....

নায়েব কহিছে বেটা ভাঙ্গিব ভণ্ডতা।

করেছিস এতদিন আজ যাবি কোথা।।

আন অই ঠাকুরকে কাছারী লইব।

আজ অই ঠাকুরের ধর্ম্ম কি শুনিব।

দশরথ বলে আমি প্রাণে যদি মরি।

সেও ভাল প্রভু কেন যাবেন কাছারী।।

করি মানা ঘরে নাহি যেও কোন জন।

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।।

মালাবতী ঘরে থেকে শুনিলেন তাই।

ডেকে বলে এখানে আসিলে রক্ষা নাই।।

দশরথ মস্তকেতে ছিল এক টিকি।

নায়েব ধরিয়া তাই দিল এক ঝাকী।।

চর্ম্মের পাদুকা ছিল নায়েবের পায়।

গোড় বাঁধা লোহাতে কঠিন অতিশয়।।

সেই জুতা খুলে মারে ক্রোধে পরিপূর্ণ।

.....

দশরথ মৃত্তিকায় শুইয়া পড়িল।

নায়েবের পদ ধরি পিট পেতে দিল।।

দশ জুতা মারিব তোরে রে দশরথ।

যাহাতে না যাস আর ঠাকুরের সাথ।।

এত বলি পৃষ্ঠে মারে দশ জুতা বাড়ি।

জরিমানা ডেকে দশরথে দিল ছাড়ি।।

ঠাকুরে না দিলি যদি ওরে বেটা বোকা।

জরিমানা করিলাম তোরে দশ টাকা।।

শীঘ্র ফেলা টাকা নৈলে আরো মার খাবি।

টাকা যদি নাহি দিস কাছারী যাইবি।

প্রভু বলে মালাবতী শীঘ্র ঘরে যাও।

দশ টাকা চাহে ওরে কুড়ি টাকা দেও।।

তাহা শুনি মালাবতী কুড়ি টাকা এনে।

নায়েব নিকটে টাকা দিলেন তখনে।।''[৭৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর দশ টাকা বেশী দিয়ে নায়েব মহাশয়কে খুশি করলেন। আর নায়েব মহাশয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিলেন যে এমন মধুর হরিনামে মত্ত হওয়ার জন্য। অর্থমূল্য দিয়ে 'হরিনাম' অর্থকে নায়েব মহাশয়ের কাছ থেকে কিনলেন। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষের কল্যাণের জন্য এই দশ টাকা বেশি দিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের নায়েব মহাশয়কে যা বললেন তা হল—

''ঘর হতে ঠাকুর কহেন নায়েবেরে।

আর দশ টাকা আমি দিলাম তোমারে।।

কত নিবে কত খাবে প্রজা বেচে রৈলে।

ধনে বংশে মজাইলে যে মার মারিলে।।

বারে বারে ইচ্ছা করো মোরে মারি বারে।

এই মার আমা ছাড়া মারিয়াছ কারে।।

জরিমানা দিলাম যে দশটাকা বেশী।

এখন নায়েব বাবু হয়েছো কি খুসী।।

এমন মধুর নামে পাষণ্ডী হইওনা।

এজন্য দিলাম আমি বেশী জরিমানা।।

এখন আমরা গান করিতে কি পারি।

পরকাল যাতে রহে বলে হরি হরি।।

নায়েব কহিছে এবে আর কার ভয়।

দিবা নিশি হরি হরি বলহ সদায়।।

অমনি বলিয়া সবে প্রভু হরিচাঁদ।

উচ্চৈঃস্বরে সবে করে নাম পদ গান।।

নামে প্রেমে দিসে হারা মাতিয়া উঠিল।

বিষাদে হরিষ হয়ে সুখেতে ভাসিল।।

.....

কোন মেয়ে বলে সবে মঙ্গল কারণ।

কি দিয়ে কি করে হরি বুঝে কোন জন।।

একাকী বিশ্বাস মহাশয় মার খেল।

নির্ব্বিঘ্ন হইল দেশ ভয় দূরে গেল।।

.....

শ্রীহরি নামের গুণ বাড়ে যে প্রহারে।

তাহাতে কি ব্যথা হত আমার অন্তরে।।

হরিনাম বিঘ্ননাশ করে খেয়ে মার।।

হরিচাঁদ হরিচাঁদ হরিচাঁদ বল।

.....

এদিকেতে সংকীর্ত্তন উঠিল মাতিয়ে।।

যামিনী হইল ভোর নাম সংকীর্ত্তনে।।

সবে প্রেমে মত্ত; ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি মনে।।

সংকীর্ত্তন হইতেছে কার নাই হুষ।

ভেদাভেদ জ্ঞান নাই নারী কি পুরুষ।।''[৭৪]

হরিচাঁদ ঠাকুরের বুদ্ধি মত্তায় নায়েবের কাছ থেকে 'হরিভক্তি'কে রক্ষা করলেন। এবং হরিচাঁদ ঠাকুরের নামে যে তীব্র অভিযোগ ছিল নায়েবের সেই অভিযোগও দশরথ বিশ্বাসকে মারের

জন্য নারীদের হৃদয়ে তীব্র দুঃখ ছিল। আর সেই সঙ্গে মিলিত হয় শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের অঙ্গে মারের চিহ্নাবলী দেখে। হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে নারীগণ জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বলেন—

''দশরথ পৃষ্ঠে জুতা মারিল নায়েব।
আমার পৃষ্ঠেতে রাখিয়াছে গুরুদেব।''[৭৫]

একথা ঠাকুরের কাছে জ্ঞাত হলেন নারীগণ ও মালাবতী ঠাকুরের পায় পড়ে এর প্রতিকার জানতে চান তখন ঠাকুর তাদের বলেন—

''প্রভু বলে তবে তোরা আয় সব নারী।
মিলাইব হাইকোর্ট মহিলা কাছারী।''[৭৬]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সক্রিয়তায় উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এক অভাবনীয় ঘটনার সূত্রপাত করলেন। যে নারীদের 'হরিনাম' গানে মত্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে মূর্খতাবশত উদ্দেশ্যে হরিচাঁদ ঠাকুরকে মার দেন। কিন্তু দশরথ বিশ্বাস ও মালাবতীর বিরোধীতার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরকে প্রত্যক্ষভাবে মারতে না পারলেও প্রতীকী ভাবে দশরথ বিশ্বাসকে মারলেও হরিচাঁদ ঠাকুরের শরীরে সেই আঘাতের চিহ্ন থাকে। তাই হরিচাঁদ ঠাকুর নায়েবকে দশ টাকা জরিমানা বেশী দিয়ে বলেন—

''বারে বারে ইচ্ছা কর মোরে মারিবারে।
এই মার আমা ছাড়া মারিয়াছ কারে।''[৭৭]

হরিচাঁদ ঠাকুর সেই বিচারের ভার অর্পণ করেন 'হরিনাম' সংকীর্ত্তনকারী সকল মহিলাকে। নারীকে আত্মশক্তির সঙ্গে নারীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও স্বাধীনভাবে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্পণ করে নারীদের তিনি পূর্ণ মানবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মহিলাদের কষ্টকে তিনি গুরুত্ব দিয়ে তাদেরকেই আত্মচৈতন্য ফিরিয়ে দিলেন। আর সমাজে যদি নারীর মর্যাদা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সমাজের কল্যাণ করা অর্ধেক সময়ে হয়ে যাবে। সমাজে অর্ধেক নারীও অর্ধেক পুরুষ বাস করে। হরিচাঁদ ঠাকুর নারীর ভক্তি যোগ ও জ্ঞানযোগ ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শিক্ষার সাথে স্বাধীন বিচার শক্তি প্রদান করেন। তা উনিশ শতকের সমাজ প্রেক্ষাপটে অভিনব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যোগ্য। নারী যে মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবনায় 'মহিলা কাছারী এবং বিচার ও হুকুম' এই অধ্যায়ের মাধ্যমেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এবং নারীরও বিচার করার ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা আছে তাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেন।

বিবাদীগণ নায়েবের কাছে নালিশ ও অত্যাচার করেই শান্ত হন নি। সময় মত সাহেবের কাছে নালিশ করেন। এবং সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুরের সঠিক পরিচয় চান ও তাকে দেখতে চান হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত দশরথের পুত্রতুল্য ছাত্র রামতনুর কাছে। রামতনু জোনাসুর কুঠি গিয়ে ডিক সাহেবকে হরিচাঁদ ঠাকুর সম্বন্ধেও হরিচাঁদ ঠাকুরের কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানানোর পর সাহেব রামতনুকে বলেন তিনি হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শনাকাঙ্খা করেন। সাহেবকে রামতনু কথা দেন যে ঠাকুর আসবেন তোমার দর্শনে। রামতনু একথা বাল্য শিক্ষক দশরথ বিশ্বাসকে সবিস্তারে জানান। দশরথ বিশ্বাস ঠাকুরকে জানান ঠাকুর শুনেই কথা দেন যে তাঁকে দেখতে চান তাকেও তিনি দেখবেন। এবং যাবার দিন ঠিক করে দেন। তারপর ঠাকুর তার প্রধান প্রধান ভক্তদের কুঠি যাওয়ার জন্য আজ্ঞা করলে সকলে সম্মিলিত হয়ে আজ্ঞানুসারে দশরথের বাড়িতে আসেন। এভাবে দশরথের বাড়িতে কুঠি যাওয়ার জন্য ভক্ত সমাবেশ হয়। সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য সকলের যাবার উদ্দ্যেগটিও স্মরণীয়। তারকচন্দ্র সরকারের বর্ণনা থেকে জানা যায়।

বিবাদীদের সাহেবকে নালিশকরণও সাহেব কর্তৃক কুঠির কর্মচারী রামতনুকে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্য ঠাকুরের সন্ধানে দশরথের কাছে পাঠানো। তারপর রামতনু প্রকৃত ঘটনা জেনে কুঠির সাহেবের কাছে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন—

"সাহেব কহিছে আমি দেখিব কেমন আদমি।
যাহ হাম পেয়াদা পাঠাই।
পাষণ্ডীরা গৃহে গেল সাহেব লোক পাঠাল;
উপনীত দশরথ ঠাই।।
পদ্মবিলা গ্রামে বাস, শ্রীরাম তনু বিশ্বাস,
বুদ্ধি মান অতি বিচক্ষণ।
কাছারী কুঠি মোকামে, রাজদ্বারে কিম্বা গ্রামে,
পরগণে মানে সর্ব্বজন।"[৭৮]

রামতনু সমস্ত সত্য ঘটনা জানতে পারেন দশরথ বিশ্বাসের কাছে। এবং সেই ঘটনাবলীকে নিরপেক্ষভাবে কুঠির ডিক সাহেবের কাছে জানান। তারক সরকারে বর্ণনায়—

''রামতনু কুঠি গিয়ে নিরপেক্ষ ভাবলয়ে,

সত্য জানাইল সাহেবেরে।

সহেব কহে বিশ্বাস, আর নাহি অবিশ্বাস;

ঠাকুরে কি দোষ কার্য করে।।

....

.....

শিঘ্র গিয়া কহ তুমি, ঠাকুর দেখিব আমি,

আসুন আমার কামরায়।।

সাহেবে কড়ার দিয়ে রামতনু গৃহে গিয়ে;

গুরুদেব নিকটেতে কয়।

দশরথ পদ ধরে, জানাইল ঠাকুরেরে,

সাহেবেরে দেখা দিতে হয়।।

মহাপ্রভু শুনি তাই, বলে যাব তার ঠাই,

করি বারে রাজ দরশন।

যে দেখিতে চাহে মোরে, আমিও দেখিব তারে,

মন চাহে তার সম্মিলন।।

ঠাকুর করিল দিন বলগিয়া আমি দীন,

কুঠি যাব তিন দিন পরে।''[৭৯]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কুঠি যাত্রার আজ্ঞাও ভক্তগণের সমাবেশ ও যাত্রার উদ্দ্যোগ—

''ঠাকুর কুঠিতে যাবে, দিন ধার্য্য করি তবে,

যে স্থানে যে ভক্তগণ ছিল।

প্রধান প্রধান ভক্ত, নানা গানে অনুরক্ত,

আসিতে সবারে আজ্ঞা দিল।।

ঠাকুর যে দিন মত লইয়া ভক্ত কত,

দশরথ ভবনে আসিল।।

....

.....

যতেক ভক্তগণ হরিনামেতে মগন,

সিংহের প্রতাপে ধায় বেগে।।

গেল দশরথ ঘর সবে হল একত্তর,

ভয়ভীত হল দশরথ।

ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখিয়া হল আতঙ্ক,

লোক হল দুই তিন শত।।''[৮০]

কুঠি যাত্রার জন্য সকলের বেশ ভূষার পরিচয় পাওয়া যায়—এখনকার সময়মত পোষাক পরিচ্ছদের এত প্রকার পোষাক তৎকালীন সময়ে ছিল না। তখনকার প্রধান পোষাক ধুতি ও চাদর পুরুষের জন্য ও মেয়ে ও নারীদের জন্য শাড়ি কাপড়ই ছিল প্রধান পোষাক। আর মতুয়া ভক্তগণও এই পোষাক পরিচ্ছদই পরিধান করেছেন। আধুনিক যুগের আগমন ঘটলে মানুষের জীবনযাত্রার অর্থাৎ কর্মপ্রণালীর নব নব উদ্যোগে মানুষের জীবন কর্ম ব্যস্ত হয় মানুষের রুচিবোধের ভাবানুযায়ী মতুয়া ভক্তগণও তাদের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তৎকালীন সময়ে সাবানের ব্যবহার ছিল না। মানুষ মাটিকে ব্যবহার করত মাথা পরিষ্কার করার কাজে। কেশ ধোয়ার জন্য।

''যাইতে হইবে কুঠি, মাথায় লইব মাটি।

কেশ মুক্ত বেশই প্রধান।''[৮১]

''কুঠিতে নাম সংকীর্ত্তন'' অধ্যায়ে ঠাকুর ভক্তগণ নিয়ে জোনাসুর কুঠি গিয়েছেন। ও সেখানে হরিনাম কীর্ত্তন করছেন। কবির বর্ণনায়—

''ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে দয়াল ঠাকুর।

চলিলেন সাহেবের কুঠি জোনাসুর।

মৃদ্ধৌত মার্জিত কেশ বেঁধে রেখেছিল।

অর্ধপথে গিয়া সবে চুল ছেড়ে দিল।।

.....

ঠাকুরের পিছে চারিখানা খোল বাজে।

অষ্ট জোড়া করতাল বাজে তার মাঝে।।

পশ্চিম দিকেতে প্রভু করেছে গমন।

মুখ পদ্মে ঝলসিছে সূর্য্যে কিরণ।।

রক্তবর্ণ চক্ষু কাল ফণী মণি ঘেরা

ভ্রুধনু মণি রক্ষে দিতেছে পাহারা।।

ভালে ফোঁটা শশী ছটা হয়েছে সংযোগ।

তাহাতে ঘটেছে যেন পুষ্প বন্ত যোগ।।''[৮২]

রামতনু ডিক সাহেবের কাছে উপস্থিত ছিলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন এহেন ঘোর শব্দের কারণ রামতনু হরিচাঁদ ঠাকুরের কথা জানান এভাবে—

''রামতনু বিশ্বাস কহিছে সাহেবেরে।

ইচ্ছা করিলেন যে ঠাকুরে দেখিবারে।।

সেই প্রভু এসেছেন লয়ে ভক্তগণ।

মহাসংকীর্ত্তন যেন ভীষণ গর্জ্জন।''[৮৩]

হরিচাঁদ ঠাকুরও ভক্তগণকে অবলোকন করে সাহেব তার অভিজ্ঞতার কথা রামতনুকে বলছেন। আর রাজার শাসননীতি একরকম আর ভগবানের নীতি অন্যরকম। সেখানে রাজা প্রজার সম্পর্ক হয় ভয় ভীতির উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরীয় সম্পর্ক হয় হৃদয়বত্তার অনুরাগে সেখানে ভালোবাসার বন্ধনই একমাত্র সম্পর্ক। তাই ভীতি হীনতা এখানে প্রধান বিষয়। আর ভয়কে জয় করার শক্তি দান করে ঈশ্বরীয় শুভ ভাবনা। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রতি প্রেমানুগত্য ভক্তের দল তার নিত্যসঙ্গী। আর এই ভক্তরাই সাহেবের কুঠিতে যায় হরিচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন করতে করতে। সেই বর্ণনা পাওয়া যায় তারকচন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে—

''সাহেব কহিছে তনু এত ভক্ত যার।

সামান্য মনুষ্য নহে বুঝিলাম সার।।

রাজা রামরত্ন রায় আমি কর্মচারী।

এতলোক একত্রিত করিতে না পারি।

যদি একত্রিত হয় রাজদণ্ড ভয়।

হেতু বিনা এত লোক ভীড় কেন হয়।।

ভক্তবৃন্দ সঙ্গে দেখি চার পাঁচ শত।

হেলে দুলে নাচে গায় যেন মদ মত্ত।।

লোকে অসম্ভব এই অলৌকিক কার্য্য।

ক্ষণ জন্মা লোক ইনি করিলাম ধার্য্য।।''[৮৪]

সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুর কোন জন বুঝতে পারেন নি। রামতনুকে সে জিজ্ঞাসা করলে সাহেবের মাতা সাহেবকে হরিচাঁদ ঠাকুরকে চিনিয়ে দিলেন।

.....

''সাহেবের মাতা বলে শুন বাছা ডিক।

ঠাকুরে দেখিয়া কি করিতে নার ঠিক।।

আজানুলম্বিত ভুজ চৌরাশ কপাল।

উর্ধরেখা করে, চক্ষু কর্ণায়ত লাল।।

চুল ছেড়ে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর ঐজন।

স্বভাবত রূপ যেন ভুবন মোহন।।''[৮৫]

সাহেব, সাহেবের মাতা হরিচাঁদ ঠাকুর ও ঠাকুর ভক্তের নৃত্যগীত দেখে তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যিই এরা হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত। তারা সকলেই হরিচাঁদ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাদেরকে অন্যায় ভাবে প্রহার নায়েবের উচিত হয় নি। তাই সাহেবের মা সাহেবকে বলেন সাধু হিংসা যেন কখন না করেন।

.....

''বেলা অপরাহ্ন হল যেতে কহ দেশে।

এই সব সাধু দিগে পাষণ্ডীরা দোষে।।

অধিনস্থ মধ্যগাতী তুমি হও রাজা।

পাষণ্ডী প্রজাকে এনে তুমি দেও সাজা।।

অগ্রভাগে ডেকে এনে করহ বারণ।

আর যেন সাধু হিংসা না করে কখন।।

.....

সেলাম করিল যদি সাহেবের মাতা।

পরিবার সহ ডিক নোয়াইল মাথা।।

.....

সাহেবের মাতা কহে শুনহে ঠাকুর।

সুখে যেন থাকে ডিক কুঠি জোনাসুর।।

কুঠি হতে মতো সব হইল বিদায়।

চতুগুণ স্ফূর্ত্তি হল হরিগুণ গায়।''[৮৬]

হরিচাঁদ ঠাকুরের সাহেব দর্শন প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্য। কারণ 'হরিনাম' কারী ভক্তগণকে মতো আখ্যা দেন। এরপর হরিনামে মত্তদের প্রধান অপরাধ ছিল নারী পুরুষে একসঙ্গে সমান অধিকার পায় হরিনাম করার এই কারণে। দশরথ বিশ্বাসকে নায়েব অত্যাচার করেন জরিমানা নেন। তারপর সাহেবের কাছেও নালিশ করেন ফলে সত্যাসত্য বিচার করার জন্য সাহেব হরিচাঁদ ঠাকুরকে দেখতে চান ও সাহেবের ধর্মাচরণকারী মানুষদের দেখে তার হৃদয়ে ভক্তি ভাবনার বিকাশ ঘটে তার পরিবার সহ হরিচাঁদ ঠাকুরকে ভক্তির দ্বারা সম্মান জানান। এতে সাহেব ও খুশি হন ও হরিভক্তগণও খুশি হন। ফলে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তরা জয়লাভ করেন। এবং ডিক সাহেব বা রাজার থেকে কোন রকম অন্যায় থেকে হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামী ভক্তরা অব্যাহতি পায়। তারা স্বাধীন ভাবে ধর্মাচরণের সুযোগ পায়। হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশিত মতেই সার্বিক ভাবে ভক্তগণ চলতে থাকেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ব্যক্তি মানুষের সমস্যার সমাধান করেও সমাজ সংস্কার করেন :

হরিচাঁদ ঠাকুর এমন এক ব্যক্তি যার প্রতিভার শেষ নেই। তিনি মানুষকে কখনোই ঘৃণা করতেন না। আর তিনি সকলকে নিজ নিজ পরিধিতেই ভালো বেসেছেন। কোন সময় তিনি কাউকে জোর করেন নি কোন বিষয়ে। অত্যাচারিত হয়েও অত্যাচারিতের প্রতি দণ্ড দেওয়ার মনোভাব ব্যক্ত করেননি। এরকম বহু ঘটনা পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে।

শ্রীশ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শ কর্মাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' গ্রন্থে। চৈতন্যবালার চৈতন্য জ্ঞানের উদয় হয় হরিচাঁদ ঠাকুরের কৃপায়। আর নারীরাও রন্ধন কার্য্য করার সহযোগে সমভাবে হরিনামে মত্ত হতেন তার পরিচয় পাওয়া যায়—

''মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাক শালে।

শুনে ধ্বনি সব ধনী ভাসে অশ্রুজলে।।

কিসের রান্না বান্না কিসের হলুদ বাটা।

নয়ন জলে ভেসে যায় হলুদ বাটা পাটা।।

কুল বধূ ধাইতেছে হইয়া আকুল।

বাল্য বৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল।।''[৮৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের ভক্তির পরিচয় পাই এভাবে—

''হরি বোলা সাধুদের ভক্তি অকামনা।

তন্ত্রমন্ত্র নাহি মানে ব্রজ উপাসনা।।

বিশুদ্ধ চরিত্র পেমে হরি হরি বলে।

অন্য তন্ত্রমন্ত্র এরা বাপপদে ঠেলে।''[৮৮]

হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে সকল প্রকার মানুষের আগমন ঘটেছিল। মতুয়া নামটিরও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দেশের অবস্থা সম্পর্কেও হরিনাম প্রচারের কথা কবিরসরাজ তারকচন্দ্র সরকার এভাবে বর্ণনা করেছেন—

''পূর্ব্ববঙ্গে হরিনাম না ছিল প্রচার।

ক্রমে ক্রমে ঘরে ঘরে নামের সঞ্চার।।

কেহ রোগে কেহ শোকে ধনের লাগিয়া।

পুত্র হীন পুত্র জন্য মিলিল আসিয়া।।

কেহ যদি হরিনাম কখন বলিত।

চমকিত হয়ে সবে গালাগালি দিত।।

.....

হরিচাঁদ রূপে হরি হল অবতার।।

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে প্রচারিলা নাম।

কিবা দিবা বিভাবরী নাহিক বিরাম।।

হরিবল হরিবল হরিবল হরি।

উচ্চে স্বরে নাম করে ব্যোম ভেদ করি।।

হাসে কাঁদে নাচে গায় হইয়া বিভোলা।

নাম শুনে রূপ দেখে কেহ বা মাতিলা।।

কেহ বলে মতুয়া কেহবা হরি বোলা।

কেহ করে গালাগালি হরি বোলা শালা।।

গালাগালি পরে ক্রমে ঢলাঢলি হয়।

ক্রমে দেশ ডুবে গেল নামের বন্যায়।।

পুত্র পেয়ে হরিবোলা হইল আনন্দ।

ওড়াকাঁদি আসে যায় করে প্রেমানন্দ।''[৮৯]

ভক্তজয়চাঁদ রাণী রাসমণির সদর কাছারীতে চাকরি করতেন। তিনিও হরিভক্ত ছিলেন। হরিভক্তদের মধ্যে মানুষ ভাবনাই বড় হয়। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে গণ্য নয় সে মানুষ। এটাই তার পরিচয় হয়। রসিক সরকার ও হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। এই রসিক সরকারের সঙ্গে অযোধ্যার রামভরত মিশ্রের পরিচয়ও আগমন ঘটে ওড়াকাঁন্দি ঠাকুরের কাছেও রামভরত হরিচাঁদ ঠাকুরে আত্মসমর্পণ করে হরিভক্ত হন। তারক সরকার মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও কাঙালী ব্যাপারীকে বাক্য লঙঘনের জন্য তাদের আত্মতত্ত্ব দান করেন। বাক্য মান্য করা উচিত। এই শিক্ষা দেন ঠাকুর। ভক্ত স্বরূপ রায়কে তার আত্মদর্শন করান হরিচাঁদ ঠাকুর। স্বরূপ রায়কে 'হরিনাম' দানে চরিত্র শুদ্ধি ঘটান। হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে ঘৃণার থেকে বিরত করার শিক্ষা দান করেন। বুদ্ধিমন্ত বৈরাগীর আখ্যানের মধ্যে তিনি ঘৃণা মহাপাপ শিক্ষা দেন। গোলকচন্দ্র রুদ্রকে হরিভক্তির মাধ্যমে তার হৃদয়ে ভক্তি বীজ রোপণ করে তাকে হরি ভক্তে পরিণত করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের ভাবাদর্শে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ ভাবনা ও সমাজ গঠন :

হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মাদর্শ হল 'হাতে কাম মুখে নাম'। কর্মশূন্য ধর্মচার প্রলাপ বচনে পরিণত হয়। ধর্ম ও কর্ম সম্মিলনে মতুয়া ধর্মের মূল ভিত গড়েছেন হরিচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের যোগ্য উত্তরসূরী হলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪৬ সালের ১৩ মার্চ। হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শেই গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সমাজের কল্যাণ কর্মে নিযুক্ত হন। হরিচাঁদ ঠাকুরের আদর্শই গুরুচাঁদ ঠাকুরের চরিত্র গঠন ও মানস গঠন। হরিচাঁদ ঠাকুরের নিদের্শেই তিনি সংসার জীবন পরিচলানার ও সমাজের উন্নতির কর্ম

প্রণালী শিক্ষা নেন পিতা ও মাতার কাছে। মাতা পিতার ধর্মাদর্শ ও কর্মাদশই তিনি সংসার জীবনে নিজে পালন করেন ও মতুয়া ভক্তদের শিক্ষা দেন। আর তিনি সকল ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর অকৃপণভাবে সমাজ মানুষের জন্য কাজ করেছেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার সময় তৎকালীন ওড়াকাঁন্দিতে ইস্কুল ছিল না। 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বিচরণ পাগল 'শ্রীগুরুচাঁদের বাল্য লীলা ও বিদ্যাভ্যাস' অধ্যায়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিদেবীর ইচ্ছা হরিচাঁদ ঠাকুরকে জ্ঞাপন করেন।

''শুনো প্রভু মনভাষ, আমার প্রাণের আশ
বিদ্যা শিক্ষা দিতে গুরুচাঁদে।।''[৯০]

হরিচাঁদ ঠাকুরের চিন্তা কার কাছে থাকবে বালক গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রশ্নের সমাধান শান্তিদেবী করেন। মোল্যাকাঁদির ভক্ত গোলক কীর্ত্তনীয়ার বাড়িতে রাখেন। ঠাকুর বলেন—

''এ গ্রামেতে স্কুল নাই, যেতে হবে অন্য ঠাই।
কার গৃহ মন মত হয়।''
মাতা বলে আমি জানি আছে ভক্তগুণ মণি,
মোল্যাকাঁদি গোলক কীর্ত্তনে।
তার পুত্র গিরিধর সমান বয়স তার।
সেই স্থান লাগে মম মনে।
....
.....
রাখিলেন অতপর, গোলক কীর্ত্তনে ঘরে,
গুরুচাঁদ রহে হর্যান্তরে।
গিরিধর সনে মিশি, একাসনে দিবা নিশি
খেলে আর লেখাপড়া করে।''[৯১]

এভাবে পিতামাতার ইচ্ছায় গুরুচাঁদ ঠাকুর নিজে লেখা পড়া করেন এবং ঠিক এভাবেই স্বীয় পুত্র শশীভূষণ ঠাকুরকেও জয়পুর গ্রামে তারক সরকারের বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শেখান। পরবর্তীকালে গুরুচাঁদ ঠাকুর হরিচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে নিজে উদ্যোগী হন স্কুল করার। স্কুল

করলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরকে আদর্শ গৃহধর্ম নীতি শিক্ষা দিয়ে গৃহ ধর্মে প্রবেশ করালেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রথমে ব্যবসা করলেন। নৌকা গঠন করে তাতে কাঁচামাল নিয়ে বন্দরে বিক্রি করেন। এবং অনেক ভক্ত মানুষ গুরুচাঁদ ঠাকুরের সহায়তায় ব্যবসা শিখে তারাও একই ভাবে ব্যবসা করে অর্থ লাভ করেন। এরপর তিনি 'লগ্নী কারবার' করে সকলকে ব্যবসায়ী নীতি শিক্ষার সঙ্গে তিনিও ধনবান হলেন ও গরীব মানুষকে ধনবান করলেন। আর যারা মহাজনের কাছে ঋণী ছিলেন তাদেরও তিনি নিজ কৌশলে মুক্ত করলেন। 'শিক্ষা বিস্তারে শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ' এই অধ্যায়ে দেখা যায় গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতার আদর্শকে জাতির প্রাণে যেমন সঞ্চার করেন তেমনি নিজে উদ্যোগী হয়ে শিক্ষা বিস্তার কল্পে যে বিশাল কার্য সম্পাদন করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তার শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে অবহিত হব।

> ''গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তদের সহায়তায় ১৯৩১ সাল নাগাদ অনগ্রসর ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে ৫৬৯ টি, সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত বর্ধমান ডিভিশনে ২৩৬টি এবং মূলত কেবল অস্পৃশ্য পতিত নমঃশূদ্র ছেলে মেয়েদের পঠন-পাঠনের নিমিত্ত ঢাকা ডিভিশনে ১০৬৭টি (এক হাজার সাতশট্টি) অর্থাৎ সর্বমোট ১৮৮২টি বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ড. সি.এস. মিডের সহায়তায় ব্রিটিশ সরকারকে দিয়ে এই বিদ্যালয়গুলিকে প্রথমত ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার স্কুলে এবং পরে এগুলিকে মিড্‌ল ইংলিশ (এম.ই.) স্কুলে অনুমোদন করিয়ে নেন। পরবর্তীতে অবশ্য এর কোন কোন স্কুল উচ্চ ইংলিশ (উচ্চ মাধ্যমিক) স্কুলেও উন্নীত হয়।''[৯২]

গুরুচাঁদ ঠাকুর এই বিশাল শিক্ষার প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন তৎকালীন ভক্তগণের সহযোগিতায় ও তৎকালীন খ্রীষ্টান মিশনারী ড. সি. এস. মীড -এর সহযোগিতার দ্বারা তাঁর পিতার ধর্মাদর্শকেই তিনি যেমন প্রসার করেন তেমনি সেই ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছিল সার্বিক উন্নতির প্রসার। গুরুচাঁদ ঠাকুর পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের সকল আদর্শকেই কার্য্যে রূপায়িত করতে সক্ষম হন। তিনি সকলকে শিক্ষা সম্পর্কে যে কল্যাণ মূলক কথা

বলেন তা তার পিতার ইচ্ছার পূর্ণতা। আচার্য মহানন্দ হালদার হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল কথাকে তুলে ধরেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের 'হরিনাম' কার্য্যের দ্বারা মানুষের আদর্শ চরিত্র গঠনের পর হরিচাঁদ ঠাকুরের ইচ্ছার দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটান শিক্ষার বিস্তার, সমাজ সংস্কার, জাতির কল্যাণ কার্যাবলীর দ্বারা গুরুচাঁদ ঠাকুর।

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীকে সংক্ষিপ্ত ভাবে এভাবে গ্রহণ করেছেন আচার্য মহানন্দ হালদার—

''রোগ শোক দুঃখ ব্যথা জ্বালা অপহারী।
পরম দয়াল রূপে এসেছে শ্রীহরি।।
তারিতে কাঙ্গাল জনে বুকে দিতে আশা।
অন্ধ প্রাণে দিতে আলো মূক মুখে ভাষা।।
পিছে পড়া নিস্বঃদল বুকে ভরা ব্যথা।
কেহ বুঝে নাই তার মরমের কথা।।
মরা দেহে দিতে প্রাণ জাগাতে সবারে।
প্রাণদাতা হরি এল সফলা নগরে।।
অসীম তত্ত্বেতে ভরা মানব জীবন।
মর্ম্মকথা ঘরে ঘরে করে বিতরণ।।
.....
.....
আশা হারা ছিল যত শুনি সেই বাণী।
আপনা বিলায়ে পুজে চরণ দুখানি।।
বিশ্বজয়ী মন্ত্র যেন সবে পেল বুকে।
পতিত পাবন হরি বলে তাঁরে ডাকে।।''[৯৩]

গুরুচাঁদ ঠাকুর এই বিশ্বপতির সন্তান। তিনি পিতার মহান আদর্শকে কার্যে পরিণত করেন পিতৃভক্তগণ সহযোগে। বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে ড. মীডের সহায়তায় লাটের সঙ্গে পরিচয় এবং কমিশনার সাহেবের সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিচয় হয়। এই কমিশনার সহায়তা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরকে এবং সর্বভাবে সহায়ক হন মীড সাহেব। এই রাজ কার্য পরিচালনার সহযোগী

কর্মীবৃন্দ গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংস্কার কার্য্যে সহায়ক হন। ফলে শ্রম সাধ্য হলেও সংগঠন ও সংস্কার কর্মের প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি সক্ষম হন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার প্রতিষ্ঠা, প্রথম পাঠশালা হয় ওড়াকাঁন্দিতে। আচার্য মহানন্দ হালদারের বর্ণনায়—

"..... রঘুনাথ পণ্ডিত সুজন।
ওড়াকাঁদি স্থিতি কৈল আনন্দিত মন।।
বার'শ সাতাশী সনে অঘ্রাণ মাসেতে।
পাঠশালা হল সৃষ্টি চৌধুরী বাটিতে।।"[৯৪]

এরপর শিক্ষা বিস্তার কল্পে গুরুচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরলাম।

"গুরুচাঁদ বলে 'শুন ভাই সব যত।
জাতির উন্নতি কিন্তু এই সূত্রপাত।।
যাক জান ধন মান তাতে ক্ষতি নাই।
সব দিয়ে এই দেশে স্কুল রাখা চাই।।
.....
মোর পিতা হরিচাঁদ বলে গেছে মোরে।
বিদ্যা শিক্ষা স্বজাতিকে দিতে ঘরে ঘরে।।
.....
শুন স্বজাতির গণ সবে মনো কথা।
বিদ্যা শূন্য ধন মান সব জানো বৃথা।।
নমঃশূদ্র জাতি যদি বাঁচিবারে চাও।
যাক প্রাণ সেও ভালো বিদ্যা শিখেলও।।
আমি বলি বিদ্যা শূন্য রবে সেই জন।
নমঃশূদ্র বলি তারে বল না কখন।।
বিদ্যাবান যেই জন তাঁরে মান্য দাও।
বিদ্যার ভিত্তিতে সবে সমাজ গড়াও।।
সেইজন বিদ্যাবান পরম পণ্ডিত।
সমাজের পতি তারে মানিবে নিশ্চিত।।

বিদ্যা ছাড়া কথা নাই বিদ্যা কর সার।

বিদ্যাধর্ম্ম বিদ্যাকর্ম্ম, অন্য সব ছার।।

বাঁচ না না বাঁচ প্রাণে বিদ্যাশিক্ষা চাই।

বিদ্যাহীন হলে বড় তার মূল্য নাই।।

বারে বারে বলি তাই স্বাজাতির গণ।

শেখ বিদ্যা রাখ বিদ্যা করে প্রাণ পণ।।''[৯৫]

একটি বৃহৎ স্বজাতি সভায় এই বিদ্যার আলোচনা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। সভার সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। আর সকলের সম্মিলিত প্রতিজ্ঞা হল—

''আজ হতে সবে মোরা অঙ্গীকার করি।

বিদ্যা ঘরে নিব তাতে বাঁচি কিংবা মরি।''[৯৬]

গুরুচাঁদ ঠাকুর শুধুমাত্র নমঃজাতির উন্নতি চিন্তা করেননি। হরিচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের নিয়েই তিনি স্বজাতির উন্নতির কথা বলেন। মূলত হরিচাঁদ ঠাকুরের কাছে যারা আসতেন সেই সব ভক্তরাই হয়েছিলেন মতুয়া ভক্ত। এই মতুয়া ভক্তদের নিয়েই গুরুচাঁদ ঠাকুরের সমাজ সংগঠন। এই মতুয়াভক্তগণ কারা ছিলেন সেই পরিচয় পাওয়া যায় মতুয়া ধর্মগ্রন্থ বলে খ্যাত সেই সকল গ্রন্থে। আচার্য মহানন্দ হালদার তার 'শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে 'মতুয়া' উপাধিতে যারা ভূষিত হয়েছিলেন তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের অভিজ্ঞতার কথা গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন। সেই কথাই কর্ম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কর্ম্মদ্যোগী হন—

''বড় কথা বলে কেহ বড় নাহি হয়।

কথা রেখ কাজ কর ছোট বড় যা হয় কর।

কথা বৃথা কাজে জানা যায় পরিচয়।।

ঘরে ঘরে এই কথা বলে গেছে মোর পিতা।

এক সূত্রে ক্রমে গাঁথা হল নমঃশূদ্র।

শুধু নমঃশূদ্র নয় যারা যারা দুঃখী রয়

সবে মিলি এক সাথে কর ধর্ম্ম যুদ্ধ।।

তেলী মালী কুম্ভকার জোলাতাঁতী মালাকার।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য আর নবশাখ।

ব্যথিত মুসলমান হল কত আগুয়ান,

হরিচাঁদে পেয়ে তারা বলে 'মোরা এক'।

....

.....

তার ভাবে ভাব ধরা তার প্রেমে মাতোয়ারা।

'মতুয়া' উপাধি কয় সে ভাব দেখিয়া।।

তিরোধান আগে পিতা বলিলেন মোরে কথা,

সেই কথা সার বলি করেছি গ্রহণ।

সে আজ্ঞা বহিয়া শিরে ঘুরি দেশ দেশান্তরে।

সেই বাণী কহি সবে শুন সভাজন।।

যে জাতির ঘরে বিদ্যা নাহি ভরে,

দুভাগ্য জানিবে তারে।

ধন মান বৃথা বিদ্যা নাহি যথা,

লোকে উপহাস করে।।"[৯৭]

গুরুচাঁদ ঠাকুর ও সকল মতুয়া ভক্তগণকে নিয়ে শিক্ষাবিস্তার জন্য যে জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচির সূত্রপাত ঘটান তা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে সমাজ সংস্কার কর্মে। ১৮৮১ সালে খুলনা জেলার দত্তডাঙা গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র গায়েনের বাড়িতে এক 'নমঃশূদ্র মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে গুরুচাঁদ ঠাকুর নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণ দেন তিনি এবং শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষার উপায় সম্বন্ধে তিনি যা বললেন তা যেমন যুগপোযোগী ও তেমনি মহামূল্যবান। সারা বাংলা থেকে দশ হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর নমঃজাতির মানুষের সুপ্ত চেতনার দ্বার উন্মোচন করে তাদের পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে এক গৌরবময় যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

"সিংহ শিশু হায় ভুলি পরিচয়

মেষ দলে রহে পড়ি।।

জাগ সিংহ জাগ বরাভয় মাগ

এ বিশ্ব দলিয়া পায়।

এ বিশ্ব সৃজন করেছে যে জন

সেই দিবে পদাশ্রয়।।

জাগাবে তোমারে তাই তব ঘরে।

নিজে হল অবতার।''[৯৮]

সুখ শান্তি বিরাজিত অতীত গৌরব গাথা এক স্বপ্নময় জীবন ছিল এই নমঃজাতির মানুষের। হারিয়ে গিয়েছিল যে দিনগুলি সেই স্মৃতি কথার দ্বারা উদ্‌ঘাটন করে পুনরায় আত্মশক্তি বলে কর্মের ধর্মের দ্বারা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জাগুক এই মহাজাতি এই কথাই তিনি ব্যক্ত করেন।

গ্রাম বাংলার এই কৃষিজীবী মানুষেরা যে এই সোনার বাংলারই মানুষ। এই মানুষদের পিতৃ পুরুষেরা মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে কি সুন্দর শস্য শ্যামল করে গড়ে তুলেছিল এই বাংলাদেশকে। বিস্মৃতির অতলে যে অতীতের স্মৃতি বিজড়িত স্বপ্নময় সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করে আত্মমর্যাদা বোধ ও আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে ঝাপিয়ে পড়তে হবে জীবন সংগ্রামে। হারিয়ে যাওয়া অতীত অধিকার অর্জন করে পুনরায় পুন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে ধর্মে কর্মের তথা সামগ্রিক কল্যাণে। এভাবেই এই নমঃজাতির অতীত ইতিহাসকে উন্মোচন করেন। তিনি আরও বলেন—

''ভূভার হারক পতিত তারক

হরিচাঁদ যেই কুলে।।

জাগো নমঃশূদ্র নহ কেহ ক্ষুদ্র

কুল ধর্ম্মে গরীয়ান।

দেখাও জগতে নমঃশূদ্র হতে

নাহি কেহ বরীয়ান।।

আত্ম পরিচয় মনে নাহি হায়!

তাই এত দূর্গতি ভালে।

পূর্ব্ব বিবরণ করবে স্মরণ

শক্তিতে ওঠরে জ্বলে।।

ধর্ম্ম রক্ষা তরে গহন কান্তারে

যে জাতি সহিল দুঃখ

প্রতাপের সাথে অস্ত্র নিয়ে হাতে

শত্রুনাশে লক্ষ লক্ষ।।

জননীর প্রায় যেই জাতি হায়।

ঘরে ঘরে দেয় অন্ন।

....

.....

ধর্ম্ম কর্ম্মোজ্বল প্রেমেতে উছল।

ঢল ঢল চোখে দৃষ্টি।

'জানে না ছলনা অসত্য বলে না'

এই নমঃশূদ্র কৃষ্টি।।''[৯৯]

যে জাতি বা মানব গোষ্ঠী তার আত্মপরিচয় সম্পর্কে সজ্ঞান নয়, যে জাতি বা সমাজ তার অতীত ইতিহাস জানে না—তারা কখনও তাদের হারিয়ে যাওয়া অতীতের মান, মর্যাদা, অধিকার ইত্যাদি ফিরে পাবার আশায় রুখে দাঁড়াতেও সক্ষম হয় না। আত্মপরিচয় না জানলে নিজেরও নিজেদের পূর্ব স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় না। নিজেদের স্বরূপ সম্পূর্ণ ভাবে জ্ঞান থাকলে কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে সে অবজ্ঞার পাত্র হয় না। অধিকার নিজেদের কর্মের দ্বারা অর্জন করে নিতে হয়। শৌর্য বীর্য সম্পন্ন প্রবল পরাক্রান্তশালী একটা মানব জাতিকে কীভাবে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে দিতে লোকালয় থেকে দূরে গহন কান্তারে, দুর্গম বনাঞ্চলে বিতাড়িত করে রাজশক্তির দ্বারা, তা সভায় আগত প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্ববোধের দ্বারা বাঁচতে হলে অতীতের হারিয়ে যাওয়া সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার আলোকে জীবনাদর্শ গঠন করতে হবে। শিক্ষা রূপ জ্ঞানালোক প্রতিটি মানবের হৃদয় গহ্বরে জ্বালতে হবে। তার জন্য শিক্ষার দরকার। গুরুচাঁদ ঠাকুর সভাজনের উদ্দেশ্যে বলেন—

''তাই বলি ভাই মুক্তি যদি চাই

বিদ্বান হইতে হবে

পেলে বিদ্যধন দুঃখ নিবারণ

চির সুখী হবে ভবে।।''[১০০]

বিখ্যাত লেখক মনিমোহন বৈরাগী তাঁর 'অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরি গুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

''পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মগুরু আছেন কি যিনি অন্ত্যজ বাংলার মুক্তিদাতা গুরুচাঁদ ঠাকুরেরমত বলতে পারেন 'বিদ্যাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে; একমাত্র বিদ্যাই মানুষকে চিরসুখী করতে পারে?' কল্পনাশ্রয়ী—অবৈজ্ঞানিক ধর্ম অজ্ঞানীদের মনের ক্ষুধা মেটাতে পারে ঠিকই; কিন্তু তা মানুষের পেটের ক্ষুধা মিটাতে পারে না।''[১০১]

শিক্ষা হল মানুষের জ্ঞানালোক পূর্ণ মানবতাবোধের বিকাশের অন্যতম সোপান। আর শিক্ষাই মানুষকে মুক্ত করতে পারে। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের সম্পূর্ণতার জন্যও মানুষের মধ্যে মনোবলকে বাড়িয়ে দিয়ে তাদের সামনে এক সুন্দর ভবিষ্যতের ছরি তুলে ধরেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের সেই মহান ভবিষ্যত বাণীটি হল—

''বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও

কার দ্বারে চাও ভিক্ষা।

রাজ শক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে

কালে হবে সে পরীক্ষা।।''[১০২]

'Knowledge is a great power' জ্ঞানই হল একটি বড় শক্তি। শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান রূপ আলোক যদি মানুষ পায় তাহলে মানুষ্যের অজ্ঞান চিরতরে বিনাশ হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের গৌরবময় দিনের আগমণ ঘটবে। তাদের ধর্মভয়, রাজভয়, থাকবে না। এমনকি শিক্ষার দ্বারা আলোকিত মানুষই মানুষকে আত্মশক্তিতে শক্তিশালী করতে পারে। এই শিক্ষিত মানুষই রাজশক্তি তথা প্রশাসনিক কার্য্যে নিয়োজিত হন। তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভারতবর্ষের শাসন পরিচালন ক্ষমতায় নিয়োগের বলে সকল প্রকার দুঃখ দুদর্শা, ব্যথা বেদনার অবসান করে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের কথা বলেছিলেন। তাইতো

মতুয়া সমাজের ত্যাগব্রতী পাগল ও গোঁসাইরা দলে দলে মানুষের আত্মদর্শন করান ধর্ম দর্শন দ্বারা ও মানুষের শিক্ষার দ্বারা দুঃখ বিমোচন করেন। ধর্ম জ্ঞান লাভ ও কর্ম জ্ঞানের জন্য গ্রামের পর গ্রামে, সভা সমিতির দ্বারা মানুষকে সংঘবদ্ধ করে আত্মীক উন্নতি ও মানব সমাজে শিক্ষার উন্নতির কথা বলেন ও কর্মে পরিণত করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথাই তৎকালীন সময়ের সকল মতুয়া ভক্তের কথা। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা নীতিই সকলে একমনে এক প্রাণে গ্রহণ করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মানুষ গঠনের আহ্বান—

.....

''জ্বেলে দাও আলো মোহ দূরে ফেল।
আধার ছুটিবে দূরে।।
....
.....
পাঠশালা কর এক সাথে মর
ভাই ভাই হোক চেনা।।
কে আছে কোথায় কি ভাবে কি হয়
দিন কাটে কোন ভাবে?
লহ সমাচার দেশ দেশান্তর
যেখানে যাহারে পাবে।।''[১০৩]

হরিচাঁদ ঠাকুর মানুষকে যে ধর্মমত দান করেন তা সূক্ষ্ম সনাতন ধর্ম। অপরদিকে হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্ম হল মানব জীবন গঠনের ধর্ম। আর গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তার দ্বারা মানুষের কর্মময় জীবনে নব ভাবে নব উদ্দোমে কাজ করার শিক্ষা। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর ধর্মকর্মের সম্মিলনকারীর ভূমিকা পালন করে মানব সমাজকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত করেন।

হরিচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্তদের সার্বিক কল্যাণকারী হলেও তাঁর কার্যবলীর মধ্যে ধর্ম চেতনায় মানুষকে আত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন এবং কর্ম প্রণালীর শিক্ষাদান করলেও তাকে পরিপূর্ণ রূপদান করেন হরিচাঁদ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। কর্ম প্রণালীর মধ্যে প্রধান জাতির উন্নতি করণ প্রক্রিয়া যেখানে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন পিতা হরিচাঁদ ঠাকুর

আর কর্ম শিক্ষা ক্ষেত্র নির্মাণ ও শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের কর্মের সংস্থান করেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। তাই মতুয়া ধর্মকে সামাজিক উন্নতির ধর্ম ও বলা যায়। হরিচাঁদঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্য প্রণালীকে বলা হয় সমাজের মানুষের শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার আদর্শে মানব জীবন গঠনের পূণ্য ক্ষেত্র।

শিক্ষাবিস্তারের গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে নেন সকল মতুয়াভক্ত সেই আদর্শেই স্কুল গড়লেন। সেই পরিচয় পাওয়া যায় আচার্য মহানন্দ হালদারের শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিতের মধ্যে। পাঠশালা গঠন ও স্কুল গঠনের পরিচয়ের বর্ণনা—

''দত্তডাঙ্গা সভা মধ্যে গুরুচাঁদ কয়।
শিক্ষা বিনা এ জাতির নাহিক উপায়।।
সেই বাণী সবে মানি নিল দেশে দেশে।
পাঠশালা করে সবে পরম উল্লাসে।।
ওড়াকাঁন্দি পাঠশালা করে রঘুনাথ।
ক্রমে ক্রমে শিক্ষাদান করে সূত্রপাত।।
নিম্ন প্রাথমিক হতে ক্রমে কালে কালে।
ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় করে কুতূহলে।।
ওড়াকাঁন্দি, ঘৃতকান্দি ঘোনাপাড়া আদি।
গ্রামে গ্রামে স্কুল হল কেহ নহে বাদী।।''[১০৪]

বাংলার যে সমস্ত মানুষ শিক্ষায় পিছিয়ে ছিল তারা গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষার জন্য আসেন ও বিদ্যালয় গঠনের যারা সহায়ক হন তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য মহানন্দ হালদার জানাচ্ছেন এভাবে—

''শিক্ষা আন্দোলন ঘরে প্রভু করে দেশে।
ভকত সুজন যত তার কাছে আসে।।
নমঃশূদ্র তেলী মালী আর কুম্ভকার।
কাপালী মাহিষ্য দাস চামার কামার।।
পোদ আসে তাঁতী আসে আসে মালাকার।
কতই মুসলমান ঠিক নাহি তার।।''[১০৫]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্ম নমঃশূদ্র কুলে। তিনি যে মানবতা বোধের দ্বারা শিক্ষা বিস্তারে উদ্দ্যোগী হয়েছিলেন সেই নীতিটিকে তিনি সকলকে জানান এভাবে—

''নমঃশূদ্র কুলে জন্ম হয়েছে আমার।
তবু বলি আমি নহি নমঃর একার।।
দলিত পীড়িত যারা দুঃখে কাটে কাল।
ছুঁসনে ছুঁসনে বলে যত জল চল।।
শিক্ষা হারা দীক্ষা হারা ঘরে নাহি ধন।
এই সবে জানি আমি আপনার জন।।
সবাকারে বলি আমি যদি মান মোরে।
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।''[১০৬]

শিক্ষা প্রসঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উন্নত চিন্তা ভাবনা এই শিক্ষালোক প্রাপ্ত শতকেও আমাদের হতবাক করে দেয়। কত বড় মানবদরদী উন্নত মনের মানুষ হলে আর কত গভীর দূরদর্শিতা থাকলে এহেন চিন্তা ভাবনা করতে পারেন—

''বাঁচি কিংবা মরি তাতে দুঃখ নাই।
গ্রামে গ্রামে পাঠশালা গড়ে যেতে চাই।''[১০৭]

হরিচাঁদ ঠাকুরও গুরুচাঁদ ঠাকুর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির অগ্রগতির পথ নির্দেশ করলেও কৃষক ভক্ত মানুষের আর্থিক সার্বিক উন্নতি তখনও ঘটেনি। কিন্তু গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্যবসা শিক্ষা দান করেন। কৃষিকার্য করার জন্য ভক্তদের আর্থিক সহায়তাও করতেন। তবুও জমিদার জোতদারদের আর্থিক শোষণের কবলে পড়ত তৎকালীন মানুষ। এহেন আর্থিক শোষণের সংকটের মধ্যেও গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর অনুগামী ভক্ত মানব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

''খাওবা না খাও দুঃখ তাতে নাই।
ছেলে পিলে শিক্ষা দেও এই আমি চাই।।
বঙ্গদেশে ভরি বার্ত্তা গেল অল্প কালে।
দেশে দেশে স্কুল করে ভকতের দলে।।''[১০৮]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের এই নির্দেশ তার অনুগামীদের মধ্যে কেবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা স্কুল গড়ার পরিচয়ের বোঝা যায়। ঠাকুরের এই বার্ত্তা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায়। হাজার

হাজার বিদ্যালয় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তারা যেন এক নতুন জীবনের স্বাদ উপভোগ করেছিলেন। এ এক সোনার দেশে এক হীরের মানুষের স্পর্শে চারিদিক পরশমণির আলোর ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে জীবন গঠন করার আহ্বানে সকলে কর্ম প্রেরণার দ্বারা জাগরিত হন।

হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক মর্যাদা দানে তাঁদের ভূমিকা :

ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই নারীকে সমাজের পুরুষের মত স্বাবলম্বি হয়ে আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন রূপে গড়ে তোলার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে 'হরিনাম' করার অধিকার দেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর নারীকে 'হরিনাম' করার সঙ্গে সমাজে শিক্ষিত সৃষ্টিশীল কাজে আত্মনিয়োগ করে তারা যেন স্বাধীন মানুষ হয়ে সমাজে অবস্থান করতে পারে তার উপযোগী শিক্ষার প্রচলন করলেন।

প্রথমে আলোচনার সুবিধার্থে হরিচাঁদ ঠাকুরের নারী শিক্ষা ভাবনার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব। হরিচাঁদ ঠাকুরের ধর্মভাবনায় নারীর মর্যাদা পুরুষের মতই গুরুত্বপূর্ণ। হরিচাঁদ ঠাকুর 'হরিনাম' ধর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীরা স্বভাবত কোমল হৃদয়া, কোমল স্বভাবা কিন্তু নাম মাহাত্ম এমনই যে নারীও চরিত্রতে দৃঢ় কর্মনিষ্ঠ ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ দেবীতীর্থ মণি। লোকে তাকে বলে—

" 'মেয়ের স্বভাব নাই' হয়ে হরি বোলা।
সে কারণে লোকে বলে তীর্থ রামবালা।।"[১০৯]

'তীর্থরামবালা' নামকরণের মধ্যেই রয়েছে নারীর শক্তিমত্তার পরিচয়। এছাড়াও নারীদের আত্মমর্যা ও আত্মজ্ঞান লাভের জন্য হরিচাঁদ ঠাকুর নারীকে তার মনুষ্যত্ববোধে উন্নীত করার জন্য সর্বদাই সচেতন করতেন। নারীরাও যে ভক্তির আধার তার পরিচয়টিও পাওয়া যায়। নারী ভক্তি যোগে পুরুষের সহাবস্থান করে থাকে তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই কয়টি ছত্রে—

"মেয়েরা যতেক সবে ছিল পাকশালে।
শুনে ধ্বনি সব ধনী ভাসে অশ্রুজলে।।

কিসের রান্না বান্না কিসের হলুদ বাটা।

নয়ন জলে ভেসে যায় হলুদবাটা পাটা।।

কুলবধূ ধাইতেছে হইয়া আকুল।

বাল্য বৃদ্ধ ধাইতেছে সব সমতুল।।''[১১০]

মেয়েরা রন্ধন পটিয়শি একথা সর্ব্বজন বিদিত। আর নারীই গৃহ শোভা তার ভক্তি হল নিত্যসঙ্গী। হরিচাঁদ ঠাকুর এই সহজ সুন্দর কথাটিকে দিয়েছেন মর্যাদা। ফলে নারীরা তাদের ভক্তির বিকাশ ঘটানোর যেমন সুযোগ পান তেমনি মানুষ হিসাবে তাদের গুরুত্ব দিলেন পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছেন। ঠাকুর বলেন ভক্তগণকে—

''পরপতি পর সতী স্পর্শ না করিবে।

না ডাক হরিকে হরি তোমাকে ডাকিবে।।''[১১১]

এখানে পুরুষকে সাবধান করেছেন তেমনি নারীরও চরিত্র সম্পর্কে সমান পবিত্রতা রক্ষা করার কথা বলেছেন। এতে নারীও পুরুষ উভয়কেই তিনি সমমর্যাদার পাশাপাশি এক সঙ্গে 'হরিনাম' গান করলেও কোনরকম মানসিক বিকৃতির হাত থেকে রক্ষাও করেছেন। পুরুষকে সর্বদা 'এক নারী ব্রহ্মচারী' হয়ে জীবনর্নিবাহ করার নির্দেশ দেন। এতে বহুবিবাহ থেকে নারী রক্ষা পাবে। ও নারী যে পুরুষের যোগ্য সহধর্মীনী তার ও মর্যাদা পাবে। হরিচাঁদ ঠাকুর নারীদের বিচার ক্ষমতার অধিকার দেন। তৎকালীন সময়ে বিষয়টি একেবারেই অভিনব হলেও আজকের সময়েও তার গুরুত্বকে আরও গভীর করে তোলে।

পিতার আদর্শ অনুসরণ করে গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া ভক্ত নারীদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য শিক্ষায়তন গঠন করে তাদের শিক্ষিত করেন। শিক্ষার জন্য বহু স্কুল গঠন করলেও নারীদের আলাদা মর্যাদা দেওয়ার জন্য ওড়াকাঁন্দিতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত গ্রন্থে আচার্য মহানন্দ হালদার এভাবে বলেন—

''নারী শিক্ষা তরে প্রভু আপন আলয়।

'শান্তি সত্য ভামা' নামে স্কুল গড়ি দেয়।।''[১১২]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিস্তারে সহযোগী ছিলেন তৎকালীন অগণিত মানুষ এবং যিনি বিশেষ ভাবে সর্বসময় সর্ব্ববস্থায় সহায়তা করেন তিনি সি.এস. মীড সাহেব। তিনিও গুরুচাঁদ ঠাকুরের সহযোগী হয়ে বিধবা বিবাহ প্রথাকে গুরুত্ব দেন। আর বাল্যবিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকার

ফলে সমাজে নারীদের বাল্যকালেই পিতৃভবন ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে গমন করতে হত আর তাদের জীবন ততটা উপযোগী হওয়ার আগেই অনেক বালিকা বিধবা হতেন। এ কারণে সমাজে বাল্য বিধবাদের একটা প্রভাব ছিল। বিধবাদের দুঃখ নিরসনের জন্য তিনি মানুষের অর্থাৎ ভক্ত মানুষের সহযোগিতায় বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছেন। বিধবা রমণীরাও যাতে সমাজে আত্মমর্যাদার সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারে অপরের গলগ্রহ না হয়ে সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের সাহায্যে ড. মীডের স্ত্রী মিসটাক মহাশয়া। একদিকে ড. মীডও মীড পত্নী মিসটাক শিক্ষা বিস্তারে সর্বভাবে উদ্দ্যোগী হয়ে শিক্ষা বিস্তারের কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে আবার বিধবাদের জন্য স্কুল ও তাদের হাতের কাজ শিক্ষার জন্য নারীদের ট্রেনিং দিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত ওড়াকাঁন্দি থেকে। এর কর্ম সম্পাদন করেন মিসটাক, মিসটমসনও গুরুচাঁদ ঠাকুর। এই যে শিক্ষাকেন্দ্র তার পরিচয় পাই এভাবে—

''নারী শিক্ষা দিতে প্রভু ব্যস্ত সর্ব্বদায়।
ওড়াকান্দি তাতে হল নারী শিক্ষালয়।।
মীডের সঙ্গিনী ধনী নাম মিসটাক।
পরম পবিত্রা দেবী নাহি কোন জাঁক।।
মিস টমসন হন সাহায্যকারিণী।
বিধবা আশ্রম গড়ে মিলে দুই ধনী।।''[১১৩]

বিধবা আশ্রমে শিল্প শিক্ষাদানের জন্য মিসটাক গুরুচাঁদ ঠাকুরের সাহায্য চান। গুরুচাঁদ ঠাকুর মিসটাকের উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ দেনও সকল নারীকেই এই নারী ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং দিতে বলেন। মিসটাক গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশ মেনে নারীদের শিক্ষার প্রচলন করেন। এই সকল তথ্যাবলীর একটি ক্রমানুযায়ী বর্ণনা পাই তা হল—

''বিধবা জীবনে তাই দুঃখে নাই অন্ত।
পতিহারা হলে নারী হয় সর্ব্বশান্ত।।
.....
''মিস্‌টাক এসে বলে প্রভুজীর ঠাই।
''বড়কর্ত্তা! এক কার্য্য করিবারে চাই।।

অনাথা বিধবা যত আছে এই দেশে।

তাদের শিখাব শিল্প আমি সবিশেষে।

জীবিকা নির্ব্বাহ তাতে অবশ্য হইবে।

বিধবা জীবনে দুঃখ আর না রহিবে।।

বিধবা আশ্রম তাই করিবারে চাই।

আপনার আজ্ঞা বিনে সাহস না পাই।।''[১১৪]

গুরুচাঁদ ঠাকুর একথা বলে মিসটাককে সম্মতি জানায় এবং বলেন—

''প্রভু বলে ''ধন্য তুমি অবলার মাতা!

তব গুণে পতিহীনা পাবে বটে গতি।

তার মধ্যে এক কথা বলিব সম্প্রতি।।

শুধু পতিহীনা নয় নারী মাত্র সব।

তোমার আশ্রয়ে এনে বাড়াও গৌরব।'' ''[১১৫]

মিসটাক সানন্দে সম্মতি জানান এবং সেই নির্দেশ মত নারী ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রী নেওয়া হল ও প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। কবির ভাষায়—

''মিসটাক বলে ''তাতে কোন বাধা নাই।

সব নারী নিব আমি যতজনে পাই।।

এই ভাবে ওড়াকান্দি নারী বিদ্যালয়।

.....

নারী ট্রেনিং স্কুল আজ হল ওড়াকান্দি।

আদি সূত্রে গুরুচাঁদ করিলেন সন্ধি।।''[১১৬]

এভাবে নারীদের সার্বিক শিক্ষার জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর কাজ করেছিলেন। আর নারীদের তিনি আত্মজ্ঞান, আত্মসচেতন, চারিত্রিক দৃঢ়তায় মানব সমাজে আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করার জন্য নারীদের বলতেন। নারী চরিত্র কেমন হবে, কেমন হলে সমাজে যে আত্ম মর্যাদার রক্ষা করতে পারবে সে সম্পর্কে নারীদের যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তা হল—

''বীর মাতা হতে হলে ও বীরাঙ্গনা।

বাঘ্র সিংহ দেখে যেন হৃদয় টলে না।।

সতীত্ব তেজেতে ঘেরা যার দেহ মন।

কামুক পশুরে ভয় করে না কখন।।

জননী সাজিয়া সবে কর শুভদৃষ্টি।

তোমারে দেখিয়া বিশ্বে হোক শান্তি বৃষ্টি।।''[১১৭]

নারীকে আত্মশক্তির এই সুমহান জ্ঞানের পরিচয় দান করেন রাজর্ষি গুরুচাঁদ ঠাকুর। এছাড়া নারীর যে স্বভাব ধর্ম গৃহকর্মে নিপুণতা তাকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি নারীকে অবসর কালে নিজ মনোনিত ধর্ম গ্রন্থপাঠের নির্দেশ দেন। যা নারীকে গৃহকর্ম নিপুণা ও ধর্ম জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হতে বলেছেন—

'' 'সুপাক' নারীর পক্ষে অতি বড় গুণ।

গৃহস্থালী সর্ব্বকর্ম্মে সাজিবে নিপুণ।।

অবসর কালে কর ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ।

ঘরদ্বার বিছানাদি রাখ ফিটফাট।।''[১১৮]

ছেলে ও মেয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি তাদেরকে সমানভাবে শিক্ষা দানের জন্য বলেন—

''বালক বালিকা সবে শিক্ষা কর দান।

খাও বা না খাও সবে কর গে বিদ্বান।।''[১১৯]

গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা বিষয়ে যে বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ সম্পাদন করেন তাঁর পরিচয় মনিমোহন বৈরাগী এভাবে ব্যক্ত করেন—

''..... ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহু পাঠশালা মধ্য ইংরাজী ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও গড়ে উঠেছিল। এবং এই সমস্ত নবগঠিত বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া নারী শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতির জন্য তিনি ইতিপূর্বে শ্রীমতি মিডের সহায়তায় ১৯৩৮ সালে ওড়াকান্দিতে একটি নারী শিক্ষা ট্রেনিং স্কুলও গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে নারীদের বিভিন্ন বৃত্তি মূলক শিক্ষা সহ বিধবা নারীদের ধাত্রী বিদ্যার প্রশিক্ষণও দেওয়া হত। ডা. সি.এস. মীড নিজেই বিধবা মহিলাদের এই প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রশিক্ষণ

শেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের ছুরি, কাঁচি, গ্লাভস ইত্যাদি সহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রও সরবরাহ করা হত। এই রকম একজন দক্ষ ধাত্রী ছিলেন জয়ধ্বনিদেবী ওড়াকান্দির এই নারী ট্রেনিং মিশন স্কুল থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে জয়ধ্বনি দেবী একজন সফল ধাত্রী হয়ে সমাজের অশেষ উপকারও করেন।''[১২০]

শিক্ষা বিস্তারে গুরুচাঁদ ঠাকুরের কার্যাবলীর মূল্যায়ন করেছেন সন্দীপ দাশগুপ্ত। সন্দীপ দাশগুপ্ত মহাশয়ের এই মূল্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাই উত্থাপণ করলাম। আনন্দ বাজার পত্রিকার রবিাসরীয় ঐতিহাসিক কলামে গত ১৪-০৪-২০০২ তারিখ রবিবার সন্দীপ দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—

''ইতিহাসে অধরাদের তালিকায় এমন আরও নাম আছে। ..... তথ্যের দিক থেকে একথাও উড়িয়ে দেওয়া গেল না, গুরুচাঁদ ঠাকুর নামে কার্যত অজ্ঞাত অন্য এক বাঙালির আন্দোলনেই পূর্ববঙ্গে হাজারেরও বেশি স্কুল হয়েছিল। এদের কারও কাজের ব্যাপকতা হয় তো বহুকথিত দু-একজন মহাজনের মত নয়।''[১২১]

এটি অর্থাৎ এই উপরিউক্ত অভিজ্ঞতাটির বাস্তবতা হল মতুয়া ধর্ম এখনও সার্বিক ভাবে আলোচিত হয় নি। তার গুরুত্ব কত গভীর ও ব্যাপকতা লাভ করবে তা বর্তমান ও ভবিষ্যতে মূল্যায়ন হবে।

তথ্যসূত্র :

১. সরকার কবিরস রাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫, পৃ. ৫৭-৫৮।

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯।

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১।

৯. পূর্বোক্ত, শ্রীশ্রীহরিচাঁদের দ্বাদশ আজ্ঞা।

১০. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১১. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১২. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৩. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৪. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৫. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৬. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৭. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৮. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

১৯. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

২০. পূর্বোক্ত, দ্বাদশ আজ্ঞা।

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৪০. হালদার, আচার্য মহানন্দ শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮, বীণা পাণি প্রেস ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৪৮।

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৪২. সরকার, কবিরসররাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৯।

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০।

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১।

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭-৮৮।

৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।

৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭।

৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯-১২০।

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪।

৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫।

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩।

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪।

৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬।

৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭।

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১।

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২।

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৪।

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬।

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪।

৯০. পাগল বিচরণ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ মাহাত্ম্য, প্রথম প্রকাশ, আমতলী, বরিশাল, পৃ. ২৮।

৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯।

৯২. বৈরাগী মনিমোহন, অস্পৃশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১১ মার্চ, রবিবার ২০১২, পৃ. ১২৩।

৯৩. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপাণি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ১১১।

৯৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮।

৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬।

৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০।

১০১. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার ২০১২, পৃ. ১২০।

১০২. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ১৩০।

১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬।

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ.

১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪।

১০৯. সরকার, কবিরসরাজ তারকচন্দ্র, শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত, শুভ প্রকাশ মতুয়া মিশন, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ই চৈত্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০১।

১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।

১১১. হালদার, আচার্য মহানন্দ, শ্রীশ্রীগুরুচাঁদ চরিত, তৃতীয় সংস্করণ, বীণাপানি প্রেস, ঠাকুরনগর, ১৯৯৮, পৃ. ৫৬৯।

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৬।

১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯।

১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭১।

১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯।

১২০. বৈরাগী, মনিমোহন, অস্পশ্য ও অনগ্রসর জাতির মুক্তি আন্দোলনে হরিগুরুচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্ম, দ্বিতীয় প্রকাশ, ষাড়াগড়িয়া লেন, শান্তিপুর, নদীয়া, ১১ মার্চ রবিবার ২০১২, পৃ. ১৩৩।

১২১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ঐতিহাসিক কলাম, ১৪.০৪.২০০২।